সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জানুয়ারি ২০১৮

প্রজাতন্ত্র দিবস ২০১৮

উপরে: ৪ জানুয়ারি ২০১৮ বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের কাছে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেন হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ॥ ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশ সেনাবাহিনি প্রধান জেনারেল আবু বেলাল মুহম্মদ শফিউল হক, এনডিসি, পিএসসি-র ভারত সফরের প্রাক্কালে হাই কমিশনারের সাক্ষাৎ ॥ ৫ ডিসেম্বর হাই কমিশনার সকাশে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি ভেন মহাথেরো ও লর্ড অ্যাবট ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ মঠের প্রতিনিধিদল ॥ ৫ ডিসেম্বর হাই কমিশনার সকাশে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের নতুন আবাসিক সমন্বয়ক এবং ইউএনডিপি আবাসিক প্রতিনিধি মিস মিয়া সিপ্পো

নীচে: ২ জানুয়ারি ২০১৮ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলালিংক মেলা ও আবুল খায়ের গ্রুপের প্রতিনিধিদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় ॥ ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ হাই কমিশনার সকাশে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের নতুন রাষ্ট্রদূত মিস মারিয়ে এনিক বুরডিন ॥ ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মো. নাসিমের সঙ্গে হাই কমিশনারের সাক্ষাৎকালে বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজের উদ্বোধনকৃত ভারতীয় ঋণ চুক্তি ও ৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ে পর্যালোচনা ॥ ৩১ ডিসেম্বর হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে ডাবর ইন্ডিয়ার কান্ট্রি ম্যানেজার শ্রী সঞ্জয় মুন্সি ও বিপণন প্রধান শ্রী অরুণাশিষ দত্তসহ হাই কমিশনের বাণিজ্য প্রতিনিধি শ্রী শিশির কোঠারির নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময়

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ০১ | পৌষ-মাঘ ১৪২৪ | জানুয়ারি ২০১৮

Website: **www.hcidhaka.gov.in**
/IndiaInBangladesh; @ihcdhaka; /HCIDhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

নিবন্ধ
পরিবেশ ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ
পৃষ্ঠা: ১৪

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ	ভাণ্ডারিয়া পৌরসভায় ১১টি জল শোধনাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ০৪
	আসামে 'ইনভেস্টরস সামিট: অ্যাডভান্টেজ আসাম' শীর্ষক সম্মেলন ০৫
	দ্বিপক্ষীয় কূটনৈতিক তৎপরতা... ০৬
ফটোফিচার	প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মিত্রবাহিনির বীর সেনানীদের সাক্ষাৎ ০৭
ফিচার	প্রজাতন্ত্র দিবস ০৮
ইতিহাস	মেরে ওয়াতন কে লোগো: কবি প্রদীপের স্বপ্নসংগীত এমিলি জামান ১০
বিজ্ঞান	টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ ১২
নিবন্ধ	পরিবেশ ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ ॥ হিমাদ্রিশেখর সরকার ১৪
মুক্তিযুদ্ধ	১. শেরপুরের যুদ্ধে বিএসএফ ॥ এ এ জাফর ইকবাল ১৬
	২. ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় উৎসব ॥ ড. আবুল আজাদ ৩২
উৎসব	বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসব ॥ এস এম মুন্না ১৮
শিশুতীর্থ	হরিয়ানার লোককাহিনি: রূপোর কূপ ২৩
কবিতা	সন্তোষ ঢালী ॥ খোশনূর ॥ সুজন হাজারী ॥ শাহীন রেজা ২৪
	গোলাম কিবরিয়া পিনু ॥ ফখরে আলম ॥ রীনা তালুকদার অনীক মাহমুদ ২৫
স্মরণ	ড. হরগোবিন্দ খোরানা: পথিকৃৎ বিজ্ঞানী ২৬
ভ্রমণ	মেঘ অরণ্য ও জলপ্রপাতের দেশে ॥ বিপ্লব দে ২৮
শিক্ষা	ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ ৩১
	ভারতের কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে বাংলাদেশের প্রথম অংশগ্রহণ ॥ অঞ্জয়রঞ্জন দাস ৩৯
ঐতিহ্য	কফিহাউসের সেই আড্ডাটা আজ... ॥ আসিফ আজিজ ৩৪
ছোটগল্প	কোন এক নবুতন ॥ সালেহা চৌধুরী ৩৬
রাজ্য পরিচিতি	উত্তর প্রদেশ ৪৩
শেষ পাতা	আশাপূর্ণা দেবী ৪৮

পৃষ্ঠা ০৮

প্রজাতন্ত্র দিবস

ভারত শাসনের জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের পরিবর্তে ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতে সাধারণতন্ত্র দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। এটি ভারতের একটি জাতীয় দিবস। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় গণপরিষদে সংবিধান কার্যকরী হলে ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কার্যকরী হওয়ার ঠিক দুই মাস আগে, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে ভারতের সংবিধান অনুমোদিত হয়। ২৬ জানুয়ারি তারিখটি সংবিধান কার্যকর করার জন্য বেছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে ১৯৩০ সালের ঐ একই দিনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের সংকল্প ঘোষণা করে। দিনটি ভারতের তিনটি জাতীয় দিবসের অন্যতম। অন্য দু'টি জাতীয় দিবস যথাক্রমে স্বাধীনতা দিবস ও গান্ধী জয়ন্তী। এই দিন সারা ভারতেই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানটি হয় নতুন দিল্লির রাজপথে। ভারতের রাষ্ট্রপতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স মো. জিলানী চৌধুরী

মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ০২ ৯৫৬৩৫৭৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

কুমারখালির মথুরানাথ প্রেস বাংলার প্রাচীন ছাপাখানা...

M N Press বা মথুরানাথ প্রেস নামে পরিচিত এই প্রেসটি বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলা (একদা নদীয়া জেলা)-র কুমারখালি শহরে স্থাপিত ছিল। প্রেসের মুদ্রণ যন্ত্রটি ১৮৫৭ সালে লন্ডনের ফিনসবেরই স্ট্রিটের Clymber Dixon & Company-তে নির্মিত হয়েছিল। এ মুদ্রণ যন্ত্রটি কলকাতার এক জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে স্থাপন করে ব্রিটিশবিরোধী প্রচার-পুস্তিকা ছাপা হত। ব্রিটিশ সরকারের পুলিশই তল্লাশি করে এই যন্ত্রটি উদ্ধার করে নিলামে বিক্রি করে। নিলামে ছাপা যন্ত্রটি কিনে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রর বাবা মথুরানাথ মৈত্র কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারকে উপহার দিয়েছিলেন। প্রেসটির প্রথমে নাম ছিল কুমারখালি প্রেস। পরে মথুরানাথ মৈত্রর নামে পরিচিত করার জন্য M N Press বা মথুরানাথ প্রেস নামকরণ করা হয়। হরিনাথের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে প্রেসটি দেখাশুনা করতেন। বর্তমানে এই ঐতিহাসিক যন্ত্রটি জীর্ণশীর্ণ পরিবেশে কাঙ্গাল কুঠিরে পড়ে আছে। এমনকি যে ঘরে যন্ত্রটি পড়ে আছে সেই ঘরের ছাদও নেই– প্রতিনিয়ত ঝড়-বৃষ্টি-রোদে যন্ত্রটি কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা শুধু দেখে যাব কিছু করব না...!

মূলত কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার যিনি (ফিকিরচাঁদ) বাউল নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত গান 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার করো আমারে' অথবা 'যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে তবে কী মা তুমি ফিরিয়ে দিতে পারতে?'

একবার কাঙ্গাল হরিনাথ, মীর মোশারফ হোসেন, রায়বাহাদুর জলধর সেন তিনজনে মিলে লালন ফকিরের অনুপ্রেরণায় শখের বাউল দল গড়েছিলেন, তা দেখে লালন সাঁইজি গান লেখেন– 'তিন পাগলের হইল মেলা নদে এসে...'

সেই কাঙ্গাল হরিনাথ শুধু বাউলই ছিলেন না, একজন সাংবাদিকও ছিলেন। তিনি *গ্রামবার্তা*র সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৩ সালের এপ্রিলে (১২৭০ বৈশাখে) মাসিক সমাচারপত্র হিসেবে *গ্রামবার্তা* প্রকাশিত হয়। একই বছরে *গ্রামবার্তা* পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। গ্রামের মানুষের দুঃখ দুর্দশা, নীলকরদের অত্যাচার আর জমিদারের জুলুমের কথা জনগণের সামনে তুলে ধরা ছিল *গ্রামবার্তা*র মুখ্য উদ্দেশ্য।

রেফুল করিম
সংস্কৃতিকর্মী, ঢাকা

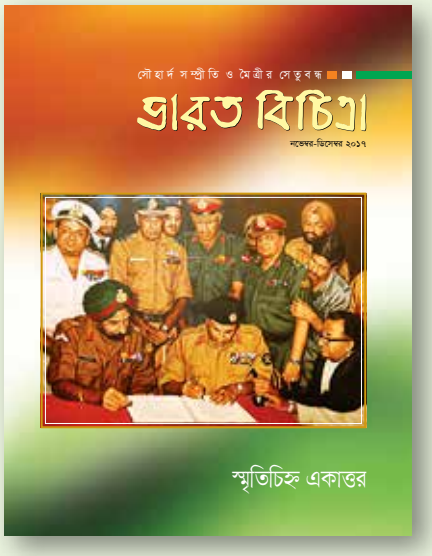

ভাগ্যিস *ভারত বিচিত্রা*কে পেয়েছি

জানার কোন শেষ নেই, তাই জানতে হলে পড়তে হবে। ভারত পৃথিবীর অন্যতম একটি বড় দেশ। পৃথিবীর অন্যতম এই বড় দেশটি সম্পর্কে জানার আছে অনেক কিছু। পাঠ্যপুস্তক, পেপার, পত্রিকা ও ছোট-বড় অনেক গণমাধ্যমের মাধ্যমে ভারত সম্পর্কে অনেক কিছু জানলেও *ভারত বিচিত্রা* পড়ে মনে হচ্ছে ভারত সম্পর্কে কিছুই জানি না। ভাগ্যিস *ভারত বিচিত্রা*র সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল। না হলে তো এত কিছু জানতাম না। *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পাচ্ছি। পেতে চাই সর্বদাই। অক্টোবর সংখ্যাটি হাতে পেয়েছি। দারুন ভাল লেগেছে এই সংখ্যাটি। রাজ্য পরিচিতিতে স্থান পাওয়া ছত্তিশগড় সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম। *তর্পণ* ভারতের কথাসাহিত্যিক ঋতা বসুর ধারাবাহিক উপন্যাস ভীষণ ভাল লেগেছে।

ভেষজ পর্বে ভারতীয় ভেষজ গাছ-গাছড়া সম্পর্কেও অনেক ধারণা পেলাম। ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানী সৌমিত্র চৌধুরীর ছোটগল্প পড়ে হারিয়ে গেলাম কল্পনার জগতে। কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণপর্বসহ পুরো ম্যাগাজিনটি আমাকে দারুনভাবে মুগ্ধ করেছে। দৃপ্ততার সঙ্গে এগিয়ে যাক *ভারত বিচিত্রা*। সঙ্গে আছি, সঙ্গেই থাকব।

আজিনুর রহমান লিমন
গ্রাম: গৌরীপুর বাজার, ডাক: গৌরীপুর বাজার
উপজেলা: দাউদকান্দি, জেলা: কুমিল্লা

ঘটনাপঞ্জি ❖ জানুয়ারি

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

০১ জানুয়ারি ১৮৯০ ❖ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৮৯৪ ❖ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৯১৪ ❖ অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৯০৩ ❖ জসীমউদ্‌দীনের জন্ম
০২ জানুয়ারি ১৯১৭ ❖ শওকত ওসমানের জন্ম
০৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ ❖ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু
০৮ জানুয়ারি ১৯০৯ ❖ আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম
১০ জানুয়ারি ১৯৫০ ❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ ❖ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ ❖ মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি
১৪ জানুয়ারি ১৯২৬ ❖ মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯০১ ❖ সুকুমার সেনের জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ ❖ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
১৯ জানুয়ারি ১৯০৫ ❖ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু
১৯ জানুয়ারি ১৯৩৫ ❖ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ ❖ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম
২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্তর জন্ম
২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ ❖ প্রজাতন্ত্র দিবস
২৯ জানুয়ারি ১৯৭৬ ❖ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর মৃত্যু
৩০ জানুয়ারি ১৯১৬ ❖ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম
৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ ❖ মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু ॥ শহীদ দিবস

প্রকৃতিতে শীতের পাতাঝরা গান। চারিদিক নিঃসীম শূন্যতা আর কুয়াশার চাদরে মোড়া। তবু তারই মধ্যে সুর্যিমামা নতুন দিনের আগমনী বার্তা নিয়ে এল। শুরু হল একটি নতুন বছরের। জয়তু ইংরেজি নতুন বছর ২০১৮। এর সঙ্গে সঙ্গে *ভারত বিচিত্রা* ছেচল্লিশ বছরে পদার্পণ করল। একটি পত্রিকার জন্যে এটি বেশ দীর্ঘ সময়। এই মুহূর্তে এটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িক পত্র।

আজকের পৃথিবী বিজ্ঞানের পৃথিবী। তবু যেন চারিদিকে অন্ধ বিশ্বাসের জমাট তমসা আমাদের আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে। কূপমণ্ডুকতার অন্ধকার দূর করতে বিজ্ঞানচর্চা তথা বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার অপরিহার্য। প্রাচীন ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক চর্চায় যেমন ছিল অগ্রগামী, তেমনি বিজ্ঞানচর্চায়ও। 'শূন্যে'র ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে গণিতের বিশ্বজোড়া ইমারত, তার আবিষ্কার এই ভারতেই। চলতি সংখ্যায় আমরা টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি, যাতে ভারতে বিজ্ঞানের প্রসারে এই প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সন্নিবেশিত হয়েছে দু'জন প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর ওপর দুটি নিবন্ধ, যাঁর একজন নোবেল পুরস্কারবিজয়ী, আরেকজন নোবেল পুরস্কার পাননি বটে, তবে তাঁর প্রদর্শিত পথে বিজ্ঞানচর্চা করে নোবেল পেয়েছেন অন্তত আধাডজন বিজ্ঞানী। এঁদের একজন ড. হরগোবিন্দ খোরানা, অপরজন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এঁদের জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের অনুসন্ধিৎসু মনের ক্ষুধা কিছুটা নিবৃত্ত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই দুই বিজ্ঞানীর জন্মতিথিতে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম নিয়ামক, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ও প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে এক বৈশ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি দিল্লির বিড়লা ভবনে এক সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় যোগ দেবার প্রাক্কালে নাথুরাম গড়্‌সে নামে এক যুবকের গুলিবর্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়। জাতির পিতার মর্মান্তিক মৃত্যুর দিনটি ভারতে শহিদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত।

বাংলার রেনেসাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল, বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মও এই মাসে, ১৮২৪ সালে। এ মাসে জন্মেছিলেন বাংলার রেনেসাঁর আরেক সার্থক ফসল, ভারতের অধ্যাত্মজগতের অন্যতম দিকপাল স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতবাসী যখন তার আত্মগৌরব ভুলতে বসেছিল, কদাচার আর পুনর্জাগরণের কোলাহলে যখন তার ধর্মবিশ্বাস দর্শন সংস্কার সভ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছিল, তখন স্বামীজী তাঁর পরম লৌকিক লোকায়ত গুরুর ধর্মবিশ্বাস তথা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সনাতন বাণী পৌঁছে দিলেন বিশ্বের দরবারে, 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়া... জগতের সবাই সুখী হোক, জগতের সবাকার মঙ্গল হোক...।' নিবীর্য কলুষভরা পৃথিবীতে বিবেকানন্দের দর্শন আমাদের পাথেয় হোক।

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনির পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের বীর সেনানীদের কয়েকজনকে বাংলাদেশের বিজয় দিবস স্মারক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বিজয় দিবসের তাৎপর্য এই যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনি ও মিত্রবাহিনির সম্মিলিত অভিযানে পর্যুদস্ত পাকিস্তানী জেনারেল নিয়াজি প্রায় ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শেরপুরের যুদ্ধে বিএসএফ-এর ভূমিকা নিয়ে একটি নিবন্ধ পত্রস্থ হল যাতে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের একটি খণ্ডচিত্র পাওয়া যাবে।

ভাণ্ডারিয়া পৌরসভায় ১১টি জল শোধনাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

৩ ডিসেম্বর ২০১৭ ভাণ্ডারিয়া পৌরসভার জনগণের জন্য ১১টি জল শোধনাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে ভাণ্ডারিয়া সফরে গিয়েছিলেন ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। তিনি অনুষ্ঠানটির আয়োজন ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'আজ পিরোজপুরে আসতে পেরে আমি দারুণ আনন্দিত। আমি সবসময় সোনার বাংলার এই অপরূপ অংশে ভ্রমণ করতে চেয়েছি এবং আপনাদের মধ্যে এসে আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করছি।'

শ্রী শ্রিংলা বলেন, 'ভারত বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা আমাদের সম্পর্কের সবচেয়ে মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির একটি। আমি এটি জানাতে পেরে খুশি যে, গত পাঁচ বছরে ভারত সরকার বাংলাদেশে ১১১ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৪টি প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে এই ক্ষুদ্র অবদান বাংলাদেশে আমাদের বন্ধুদের জীবনে একটি গুণগত পরিবর্তন আনবে।'

তিনি আরও বলেন, 'এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা ভাণ্ডারিয়া উপজেলায় ১১টি জল শোধনাগার স্থাপনের কাজ উদ্বোধন করছি। আমরা খুবই গর্বিত যে এই জল পরিশোধন প্রকল্পগুলো ভাণ্ডারিয়া ও এর নিকটবর্তী পৌরসভার দেড় লক্ষ মানুষকে বিশুদ্ধ ও মিষ্টি পানীয় জল সরবরাহ করবে। এই কাজের জন্য ভারত সরকার ভাণ্ডারিয়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে সাড়ে ১১ কোটি টাকা সরাসরি নগদ অনুদান দিচ্ছে। প্রকল্পটির কাজ দ্রুত শুরু করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালের অক্টোবরে ভাণ্ডারিয়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে আগাম ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছিল।'

এই প্রকল্পের আওতায় আনুমানিক ৬০০ ফুট গভীরতাসম্পন্ন ১১টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে। প্রতিটি নলকূপ স্থাপিত এলাকায় একটি করে নির্দিষ্ট জল শোধনাগারও স্থাপন করা হবে। পরিশোধিত জল ১১টি এলাকার প্রতিটিতে ৪০০০০ লিটার করে বৃহৎ ট্যাংকে সংরক্ষণের জন্য তোলা হবে। পানোপযোগী করার জন্য প্রতিটি জল শোধনাগারে জল থেকে ভারী ধাতু, আর্সেনিক ও লবণাক্ততা অপসারণ করা হবে। প্রকল্পের কাজ আগামী ৯ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যদিও ভারত সরকার জল শোধনাগারগুলি স্থাপনে সহযোগিতা করছে তবে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব পরিবেশ ও বন মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর, যাঁর উদ্যোগে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের এক দৃঢ় সমর্থক। তিনি ভারতের একজন ভাল বন্ধুও বটে।

হাই কমিশনার তাঁকে ভাণ্ডারিয়া সফরে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুসহ ভাণ্ডারিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান, পরিষদের অন্যান্য সদস্য এবং ভাণ্ডারিয়াবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ছাড়াও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন মহারাজ, পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক খায়রুল আলম শেখ, পুলিশ সুপার সালাম কবিরসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

আসামে ‘ইনভেস্টরস সামিট: অ্যাডভান্টেজ আসাম’ শীর্ষক সম্মেলন

২০ ডিসেম্বর হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা আসামের অর্থমন্ত্রী শ্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ও পূর্তমন্ত্রী শ্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে স্বাগত জানান। তাঁরা ‘ইনভেস্টরস সামিট : অ্যাডভান্টেজ আসাম’ শীর্ষক সম্মেলনে সরকার ও শিল্প নেতাদের আমন্ত্রণ জানাতে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

২০১৮-এর ০৩-০৪ ফেব্রুয়ারি অ্যাডভান্টেজ আসাম-এর ‘আসাম গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিট’ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যা কিনা আসাম সরকারের সর্ববৃহৎ বিনিয়োগ এবং সহায়তা বৃদ্ধির একটি উদ্যোগ। আসামের সরকার বিনিয়োগকারীদের কাছে রাজ্যের ভূকৌশলগত সুবিধাগুলি তুলে ধরার লক্ষ্যে এ সম্মেলনের আয়োজন করছে। সম্মেলনে আসিয়ান ও বিবিএন-এর মত ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশসমূহে রপ্তানীমুখী উৎপাদন ও সেবা দানের ক্ষেত্রে আসাম সরকারের উৎপাদন দক্ষতা এবং সুবিধাদি তুলে ধরা হবে।

আসামের অর্থমন্ত্রী শ্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং গণপূর্ত মন্ত্রী শ্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ঢাকা সফরকালে ভারতীয় হাই কমিশনে আসেন এবং হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের পক্ষ থেকে ‘আসাম গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিট’-এ অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

মানবকল্যাণে অর্থ সহায়তা...

১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ ভারতের অর্থায়নে বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজের উদ্বোধন করা ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে ৬-তলা ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। শ্রী রামকৃষ্ণের শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মানবকল্যাণে অর্থ সহায়তা...

২১ ডিসেম্বর হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা যশোর-৫ আসনের সাংসদ শ্রী স্বপন ভট্টাচার্যের আমন্ত্রণে যশোরের মণিরামপুর উপজেলা ও শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের নতুন মন্দির পরিদর্শন করেন

দ্বিপক্ষীয় কূটনৈতিক তৎপরতা...

উপরে: ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে অতিথি শিক্ষক হয়ে আসা আইআইএম আহমেদাবাদ-এর পরিচালক মি. এরোল ডি'সুজা এবং অনুষদ সদস্য শ্রীমতী বৈভবী কুলকার্নির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিশ্বব্যাংকের এই প্রকল্পটি পরিচালনা করছেন আর্নস্ট এন্ড ইয়ং এর শ্রী বিদ্যুৎ ঠাকুর ॥ এর আগে ১১ নভেম্বর ২০১৭ হাই কমিশনার কলকাতায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-এ আইআইএম-এর পরিচালক অধ্যাপক শৈবাল চট্টোপাধ্যায় এবং অনুষদ প্রধান অধ্যাপক পাণ্ডুরঙ ভট্ট আয়োজিত 'মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা: কেন এবং কিভাবে'বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন

মাঝে: ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ভারত-বাংলাদেশ বর্ধিত ঋণচুক্তির আওতায় খুলনা-মংলা রেল লাইন এবং মংলা বন্দর প্রকল্প বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব ও ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের অর্থউপদেষ্টা ড. সুমিত জেরাঠের সঙ্গে কর্মব্যস্ত দিন অতিবাহিত করেন

নীচে: ২৮ ডিসেম্বর ভারতীয় হাই কমিশনার বাংলাদেশের সংসদ সদস্য শ্রীমতী হ্যাপি বড়ালকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান ॥ একই দিনে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক শ্রী সুজিত রায় নন্দীর মা শ্রীমতী হিরণপ্রভা রায় নন্দীর পরলোকগমনে সমবেদনা জানাতে হাই কমিশনার তাঁর শান্তিনগরের বাসভবনে যান

ভারতীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যর্থনা ও বিদায়...

২৬ ডিসেম্বর ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনে যোগ দেয়া নতুন কর্মকর্তা ও স্টাফ সদস্যদের স্বাগত জানান এবং দায়িত্বকাল শেষ করা কাউন্সেলর শ্রীমতী অরুন্ধতী দাশসহ অন্যান্য অফিসারদের বিদায় জানান

ফটোফিচার

১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ গণভবনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় মিত্রবাহিনির বীর সেনানীদের সাক্ষাৎ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়

ফিচার

প্রজাতন্ত্র দিবস

ভারত শাসনের জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের পরিবর্তে ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতে সাধারণতন্ত্র দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। এটি ভারতের একটি জাতীয় দিবস। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় গণপরিষদে সংবিধান কার্যকরী হলে ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কার্যকরী হওয়ার ঠিক দুই মাস আগে, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে ভারতের সংবিধান অনুমোদিত হয়। ২৬ জানুয়ারি তারিখটি সংবিধান কার্যকর করার জন্য বেছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে ১৯৩০ সালের ঐ একই দিনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের সংকল্প ঘোষণা করে। দিনটি ভারতের তিনটি জাতীয় দিবসের অন্যতম। অন্য দু'টি জাতীয় দিবস যথাক্রমে স্বাধীনতা দিবস ও গান্ধী জয়ন্তী। এই দিন সারা ভারতেই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানটি হয় নতুন দিল্লির রাজপথে। ভারতের রাষ্ট্রপতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন।

ইতিহাস

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টে দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পায়। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রায় সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলন। স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় যুক্তরাজ্যের সংসদে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হওয়ার মাধ্যমে। এর ফলে ব্রিটিশ ভারত ভেঙে গিয়ে কমনওয়েলথ অফ নেশনস-এর অন্তর্গত অধিরাজ্য হিসেবে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। ১৫ আগস্টে ভারত স্বাধীন হলেও দেশের প্রধান হিসেবে তখনও বহাল ছিলেন ষষ্ঠ জর্জ এবং লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ছিলেন এর গভর্নর জেনারেল। তখনও দেশে কোন স্থায়ী সংবিধান ছিল না; ঔপনিবেশিক ভারত শাসন আইনে কিছু রদবদল ঘটিয়েই দেশশাসনের কাজ চলছিল। ১৯৪৭ সালের ২৮ আগস্ট একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য ড্রাফটিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। ৪ নভেম্বর ১৯৪৭ তারিখে কমিটি একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে গণপরিষদে জমা দেয়। চূড়ান্তভাবে সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিনের মধ্যে গণপরিষদ এই খসড়া সংবিধান আলোচনার জন্য ১৬৬ বার অধিবেশন ডাকে। এই সমস্ত অধিবেশনে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল। বহু বিতর্ক ও কিছু সংশোধনের পর ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদের ৩০৮জন সদস্য চূড়ান্ত সংবিধানের হাতে-লেখা দু'টি নথিতে (একটি ইংরেজি ও অপরটি হিন্দি) স্বাক্ষর করেন। এর দু'দিন পর সারা দেশব্যাপী এই সংবিধান কার্যকর হয়।

উদ্‌যাপন

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের প্রধান কর্মসূচী পালিত হয় ভারতের রাষ্ট্রপতির সামনে জাতীয় রাজধানী নতুন দিল্লিতে। এই দিন রাজপথে আড়ম্বরপূর্ণ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় যা ভারত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। ২০১৪ সালে ৬৫তম প্রজাতন্ত্র দিবসে মহারাষ্ট্র সরকার প্রথমবার দিল্লি প্রজাতন্ত্র দিবস কুচকাওয়াজের অনুকরণে মেরিন ড্রাইভ বরাবর তাদের নিজস্ব কুচকাওয়াজের আয়োজন করেছিল।

দিল্লি প্রজাতন্ত্র দিবস কুচকাওয়াজ

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় রাজধানী নতুন দিল্লিতে কুচকাওয়াজ হয় রাষ্ট্রপতির আবাসস্থল রাষ্ট্রপতি ভবনের নিকটবর্তী রাইসিনা হিল থেকে রাজপথ বরাবর ইন্ডিয়া গেট ছাড়িয়ে। কুচকাওয়াজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতি রাজপথের একপ্রান্তে অবস্থিত ইন্ডিয়া গেটে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত অজানা সৈন্যদের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মারক 'অমর জওয়ান জ্যোতি'তে একটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এর পর ঐ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে নিহত সৈন্যদের প্রতি এইভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এর পর রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হন এবং প্রধান অতিথির সঙ্গে রাজপথে অবস্থিত অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে আসেন। রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষকরা ঘোড়ার পিঠে করে তাঁদের পথ প্রদর্শন করেন।

বিটিং রিট্রিট

বিটিং রিট্রিট দ্বারা প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি সূচিত হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের ৩দিন পর ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যেবেলা বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের সামরিক বাহিনির তিন প্রধান শাখা ভারতীয় স্থলসেনা, ভারতীয় নৌবাহিনি এবং ভারতীয় বায়ুসেনা এই রিট্রিটে অংশ নেয়। রাজপথের প্রান্তে ভারতের কেন্দ্রীয় সচিবালয় ও রাষ্ট্রপতি ভবনের নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক ভবন দু'টির মধ্যবর্তী রাইসিনা হিল ও বিজয় চকে এই অনুষ্ঠানটি হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি, যিনি অশ্বারোহী 'পিবিজি'(প্রেসিডেন্টস বডিগার্ডস/রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী)-র প্রদর্শিত পথে এগিয়ে আসেন। তিনি উপস্থিত হলে পিবিজির অধিনায়ক তাঁর বাহিনিকে জাতীয় অভিবাদনের (স্যালুট) নির্দেশ দেন। এরপর সামরিক বাহিনি কর্তৃক ভারতের জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। এই সংগীতের পাশাপাশি সম্মিলিত স্থল, জল ও বায়ুসেনার বিভিন্ন ব্যান্ড, পাইপ, ভেরি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের কুশলীরা অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে সারে জাঁহা সে আচ্ছা প্রভৃতি দেশাত্ববোধক গানের আয়োজনও করেন।

সাম্মানিক

১৯৫০ থেকে ভারত প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অথবা গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সাম্মানিক রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বরণ করে আসছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় (আরউইন মঞ্চ, কিংসওয়ে, লালকেল্লা ও রামলীলা ময়দান)। ১৯৫৫ থেকে বর্তমান স্থানটি নির্দিষ্ট হয়। অতিথি রাষ্ট্র কে হবে তা নির্ধারিত হয় কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এর দশকের মধ্যে বেশ কিছু জোট-নিরপেক্ষ ও পূর্ব ব্লক রাষ্ট্রকে ডাকা হয়েছিল। ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অনেক পাশ্চাত্য নেতাকেও ডাকা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল এই যে, চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ঐ দুই রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসে পাকিস্তানের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ভারতের সাম্মানিক অতিথি ছিলেন। এর কয়েকদিন পরেই দুই দেশের যুদ্ধ বাধে। একাধিকবার যে সমস্ত রাষ্ট্র আমন্ত্রিত হয়েছে তাদের মধ্যে আছে প্রতিবেশী ভুটান ও শ্রীলঙ্কা; প্রতিরক্ষা মিত্র ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন/রাশিয়া, যুক্তরাজ্য; বাণিজ্য সহযোগী ব্রাজিল এবং জোট-নিরপেক্ষ মিত্রগোষ্ঠী নাইজিরিয়া ও ভূতপূর্ব যুগোস্লাভিয়া। ভুটান ও ফ্রান্স সবচেয়ে বেশি চারবার করে আমন্ত্রিত হয়েছে, আর তাদের পরেই আছে মরিশাস ও সোভিয়েত ইউনিয়ন/রাশিয়া– শেষোক্ত দু'টি দেশই আমন্ত্রিত হয়েছে তিনবার করে।

● সংকলিত

ইতিহাস

মেরে ওয়াতন কে লোগো

কবি প্রদীপের স্বপ্নসংগীত

এমিলি জামান

নড়বড়ে সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া আয়াসসাধ্য। এক্ষেত্রে নিত্য আসা-যাওয়া বিঘ্নিত হয় বলে দু'পারের মানুষগুলোর ঈপ্সিত ভাব-বিনিময় আর ঘটে না। সেতু হয়ে ওঠে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। গায়ক ও শ্রোতার মাঝে গান মজবুত সেতু হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি সেটা হয় গানের মত গান।

যারা সাধারণ শ্রোতা, তারা গানের বিষয়বস্তু, নির্মাণকৌশল ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামান না। গান তাদের কাছে চটজলদি প্লেটে পাওয়া ফাস্ট-ফুডের মত। এদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠেন মাত্র একজন– তিনি 'ভয়েস-পারফর্মার'। দীপের সলতে-পাকানোর অধ্যায়টি পড়ার সুযোগ তারা পান না। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়– পড়েন না।

কণ্ঠসম্রাজ্ঞীকে সঙ্গত করতে একে একে এগিয়ে এলেন আরো ক'জন– প্রডিউসার মেহ্‌বুব খান, সংগীতকার সি রামচন্দ্র এবং ট্রেইনার সিংগার ও অর্কেস্ট্রেশনের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (তখনকার হেমন্তকুমার)। লতার প্রথমবারের মহড়ায় কো-সিংগার হিসেবে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছোট বোন, শিল্পী আশা ভোঁসলে।

ক্যামেরার পেছনে এবং ক্যামেরার ক্লোজ-আপ ফ্রেমিংয়ের বাইরে যাঁরা থাকেন, সেই গীতিকার সুরকার ট্রেইনার সিংগার যন্ত্রসংগীত-সমন্বয়ক যন্ত্রীদল, সাধারণ মাপের শ্রোতা ও দর্শক তাঁদের নিয়ে ভাবেন না বললেই চলে। অথচ, ক্যামেরার পেছনে কর্মরত মানুষগুলোই রসোত্তীর্ণ শিল্পের মজবুত ভিত্তিপ্রস্তর।

'রোম ওয়াজ নট বিলট্ ইন আ ডে' ইংরেজি প্রবাদটি 'নির্মাণ' শব্দটির অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয়। 'ধর তক্তা মার পেরেক' করে কোন কালজয়ী শিল্প জন্মলাভ করে না বা করতে পারে না। এরকম গৌরচন্দ্রিকার কারণ খুঁজতে আমাদের কিঞ্চিৎ অতীত-বিচরণ ও অতীত-তর্পণ করতে হবে।

ফ্লাশ ব্যাক...

১৯৬২ সাল। চিন-ভারত লড়াই চলছে। ভারত-সীমান্ত যুদ্ধ-বিধ্বস্ত। অগুনতি দেশ দরদী ভারতীয় তরুণ সৈনিক গুলির ঘায়ে কলজে ছিঁড়ে দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ করলেন। সময়ের ধর্মে বাজল শেষের ঘণ্টা। একসময় শেষ হল যুদ্ধ। পেরিয়ে গেল কয়েকটা দিন।

মুম্বইয়ের মাহিম বিচে পায়চারি করছেন ভাবনায় নিমগ্ন কবি প্রদীপ। স্নায়ুতন্ত্রীতে ক্রমাগত আঘাত হানছে সদ্য সমাপ্ত সীমান্তযুদ্ধের শোচনীয়তা। সৈকত-বিহারমগ্ন এক সঙ্গীর কলমটা ধার নিলেন। শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেট প্যাকেটটি হয়ে উঠল তাঁর গীতিকাব্যের খাতা। প্রতিভা-শাণিত মস্তিষ্ক দ্রুত কথা জোগাল কলমের ডগায়। জন্মলাভ করল কাব্যগীতির সূচনা-স্তবক। স্তবকটির অংশ বিশেষ...

'এ্যায় মেরে ওয়াতন কে লোগো,
... ...
ল্যাহ্‌রা লো তিরঙ্গা পিয়ারা।
পার মাত ভুলো সীমা-'পর
বীরনে হে প্রাণ গাবায়ে
কুছ ইয়াদ উঝে ভি করল,
যো লোটকে ঘর না আয়ে।'

তারপর দিনকয়েকের চিন্তাশ্রম দাঁড় করাল এক অনুপম গীতল কবিতা। স্বনির্মিত কবিতায় প্রদীপ গানের আওয়াজ শুনতে পেলেন। অনতিবিলম্বে দারস্থ হলেন কণ্ঠসম্রাজ্ঞীর। ঐ সংগীতকন্যা সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে আজ ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর। না, লতা আগ্রহ দেখালেন না। যে গান মৃত সৈনিকের বেদনাজারিত স্তুতিগাথা– সুতীব্র ব্যথার চিত্রকল্প, সে গান কণ্ঠে ফোটানো সহজ নয়। পর্যাপ্ত মনোযোগ আর শ্রম না দিলে গানটি হবে আবেদনহীন। দিনরাত ফিল্মি গানে ব্যস্ত লতার হাতে সময় কোথায়! তাছাড়া, দেশাত্মবোধক গান কি আর ফিল্মি গানের মত শ্রোতাপ্রিয় হবে! দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন লতা।

কিন্তু, অধ্যবসায়ী প্রদীপ হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। স্নেহের স্বরে লতাকে বোঝাতে লাগলেন– 'লতা তুম দেখ্‌না ইয়ে গানা বহোত চলেগা। লোগ হামেশাকে লিয়ে ইসে ইয়াদ রাখেঙ্গে।'

স্নেহের চেয়ে বড় কোন অস্ত্র হয় না। ঘায়েল হলেন কণ্ঠসম্রাজ্ঞী। শুধু জুড়ে দিলেন ছোট্ট একটি শর্ত। গানটির মহড়া চলাকালীন প্রদীপজীকে উপস্থিত থাকতে হবে।

কণ্ঠসম্রাজ্ঞীকে সঙ্গত করতে একে একে এগিয়ে এলেন আরো ক'জন– প্রডিউসার মেহ্‌বুব খান, সংগীতকার সি রামচন্দ্র এবং ট্রেইনার সিংগার ও অর্কেস্ট্রেশনের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (তখনকার হেমন্তকুমার)। লতার প্রথমবারের মহড়ায় কো-সিংগার হিসেবে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছোট বোন, শিল্পী আশা ভোঁসলে। লতার ইচ্ছে ছিল গানটিকে ডুয়েট গানের ফর্ম দেবেন কিন্তু ফাইনাল রেকর্ডিংয়ের আগে আশা চাইলেন, গানটি তাঁর দিদি এককভাবে পারফর্ম করুন।

ধীরে ধীরে কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে উঠল কবি প্রদীপের স্বপ্নসংগীত।

ফ্লাশ ফ্রন্ট...

২৬ জানুয়ারি, ১৯৬৩। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। দিনটিকে সম্মান জানাতে ২৭ জানুয়ারি দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য আয়োজন। মঞ্চ আলো করলেন রাষ্ট্রপতি সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহ্‌রু এবং আরো অনেক গণ্যমান্য রাষ্ট্র-ব্যক্তিত্ব।

একটু যেন ঘাবড়ে গেলেন কণ্ঠসম্রাজ্ঞী। কিন্তু অদৃশ্য থেকে কলকাঠি নাড়লেন মহান ঈশ্বর। নেহ্‌রুজী অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'বেটি, তুনে মুঝে রুলা দিয়া।' আরো যোগ করলেন, 'Those who don't feel inspired by *Aye Mere Watan Ka Logo*, don't deserve to be called a Hindustani.'

আয়োজকদের ত্রুটির কারণে অমর গানটির রচয়িতা কবি প্রদীপ উল্লিখিত অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ পাননি।

তবে এর কিছুদিন পর ২১ মার্চ মুম্বইয়ে আর এম হাই স্কুলের এক অনুষ্ঠানে প্রদীপজী স্বয়ং পারফর্ম করলেন গানটি, নেহ্‌রুজীর সম্মানে। সেই সঙ্গে শিল্পরসিক প্রধানমন্ত্রীর হাতে উপহার হিসেবে তুলে দিলেন তাঁর স্বহস্ত-লিখিত লিরিকটি।

২৭ জানুয়ারি দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। সংগৃহীত অর্থের পুরোটাই সেনা কল্যাণ তহবিলে জমা দেওয়া হয়। প্রদীপজীর ইচ্ছে ছিল গানটির রেকর্ড বিক্রির রয়্যালটি যেন যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সৈনিকদের বিধবা পত্নীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গানটির সঙ্গে সম্পৃক্ত কেউই এতে অমত করেননি– সাগ্রহে প্রদীপজীকে সমর্থন জানান। লতাজী পরে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'একটি নন-ফিল্মি গান যে আমার সিগনেচার-সঙ হয়ে যাবে, এটা একবারের জন্যেও ভাবিনি। *মেরে ওয়াতন কে লোগো* না গেয়ে কোন কনসার্ট থেকেই ফিরতে পারিনি আমি।' তিনি আরো যোগ করেন, 'আমিতো শুধু গানটি গেয়েছি। সবচেয়ে বড় অবদান তাঁদের, যাঁরা দেশের জন্য তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।'

চিন-ভারত যুদ্ধের অন্যতম সাক্ষী ভারতীয় সৈনিক ব্রিগেডিয়ার চিত্রাঞ্জন সাওয়ান্ত গানটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

২০০৫ সালে মুম্বই হাইকোর্ট ভারতীয় মিউজিক কোম্পানি এইচএমভি-কে গানটির রয়্যালটি যুদ্ধাহত প্রতিবন্ধী ও বিধবাদের জন্য গঠিত তহবিলে জমা দিতে নির্দেশ দেন।

জয়তু কবি প্রদীপ!

এমিলি জামান প্রাবন্ধিক, সংস্কৃতিকর্মী

বিজ্ঞান

টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ

ভারতের মুম্বইয়ে অবস্থিত বেসরকারি গবেষণা সংস্থা টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (টিআইএফআর) গণিত ও বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা কাজে নিয়োজিত। মুম্বইয়ের কোলাবার নেভি নগরে অবস্থিত এই বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারত সরকারের আনবিক শক্তি বিভাগের অধীনে কাজ করে। এর আরেকটি অনুমোদিত ক্যাম্পাস আছে হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী শ্রীলিঙ্গমপল্লীতে। টিআইএফআর প্রাথমিক ভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত, জীববিজ্ঞান এবং তত্ত্বীয় কম্পিউটার সায়েন্সের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে থাকে এবং এটি ভারতের অন্যতম সেরা একটি গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। টিআইএফআর-এর সকল বিষয়ে স্নাতক কর্মসূচি রয়েছে যার পরিসমাপ্তি ঘটে পিএইচ ডি-তে। এটি ভারতের মানব সম্পদ মন্ত্রণালয়ের 'এ' গ্রেডভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। মহারাষ্ট্রের ৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটি ছাড়া ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল টেকনোলজি (টিআইসিটি), টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্সেস্ (টিআইএমএস) এবং সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফিসারিজ এডুকেশন (সিআইএফই) কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থায়নপুষ্ট প্রতিষ্ঠান।

ভারতীয় আনবিক শক্তি কর্মসূচির উন্নয়নে হোমি ভাবার উন্নয়নের অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। ১৯৪৪ সালে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্টকে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আর্থিক সহায়তা করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন। টাটা গ্রুপের তৎকালীন চেয়ারম্যান জেআরডি টাটার সহায়তায় ১৯৪৫ সালের ১ জুন হোমি ভাবাকে প্রথম পরিচালক নিযুক্ত করে টিআইএফআর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে বেঙ্গালোরের ভারতীয় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ক্যাম্পাসের মধ্যেই এর যাত্রা শুরু করে। পরে সে বছরেরই শেষ নাগাদ এটি মুম্বইয়ে স্থানান্তরিত হয়। টিআইএফআর-এর কোলাবার নতুন ক্যাম্পাসের স্থাপত্য নকশা করেন শিকাগোভিত্তিক স্থপতি হেলমুট বার্টস্‌ক্। ১৯৬২ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহ্‌রু এর উদ্বোধন করেন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে ১৯৪৯ সালে টিআইএফআর-কে কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএফআইআর) পরমাণু গবেষণায় সব ধরনের ব্যাপক মাত্রার প্রকল্পের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভাবার দুই কৃতী ছাত্র বিএম উদ্‌গাঁওকর এবং কেএম সিংভির নেতৃত্বে প্রথম তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে ভাবা টিআইএফআর-এ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনের বিষয় এলিমেন্টারি পার্টিকল ফিজিক্স। রুডলফ্ পিয়েরল্, লিউঁ রোজেনফিল্ড, উইলিয়াম ফাউলার এবং মেঘনাদ সাহা, বিক্রম সারাভাইয়ের মত দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান বিজ্ঞানী এ সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে টিআইএফআর কসমিক রে ফিজিক্সের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে– উটি এবং কোলার স্বর্ণখনিতে গবেষণা করার সুবাদে।

১৯৫৭ সালে টিআইএফআর-এ ভারতের প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার টিআইএফআরএসি নির্মিত হয়। ব্রিটিশ ফিজিওলোজিস্ট আর্চিবল্ড হিলের পরামর্শক্রমে ভাবা ওবায়েদ সিদ্দিকীকে মলিকিউলার বায়োলজি বিষয়ে একটি রিসার্চ গ্রুপ প্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ জানান। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে প্রায় ২০ বছর পর বেঙ্গালোরে ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস্ (এনসিবিএম) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে টিআইএফআর উটিতে উটি রেডিও টেলিস্কোপ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রেডিও এস্ট্রোনমির ওপর গবেষণা শুরু করে। ওআরটি-র সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে গোবিন্দস্বরূপ জেআরডি টাটাকে পুনের কাছে বৃহদাকার মিটারওয়েভ রেডিও টেলিস্কোপ প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহায়তা চান।

২০০২ সালে টিআইএফআর আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। গবেষণাগার ও সংস্থানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে হায়দ্রাবাদে একটি নতুন ক্যাম্পাস নির্মাণ করেছে।

গবেষণা

টিআইএফআর-এর গবেষণাকে ৩টি ধারায় ভাগ করা যায়। এগুলি হচ্ছে– গাণিতিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কম্পিউটার বিজ্ঞান ধারা।

স্কুল অফ ম্যাথমেটিক্স

১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে টিআইএফআর স্কুল অফ ম্যাথমেটিক্স্ গণিতে অনেক মেধাবী অবদান রেখে চলেছে। টিআইএফআর গণিতবিদদের উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে রয়েছে রাঘবন নরসিমহনের এমবেডিং অফ ওপেন রিমান সারফেস-এর প্রমাণ, পলিনমিন্যাল রিং-এর ওপর প্রদর্শনমূলক মোডিউল সংক্রান্ত সিএস সেশাদ্রির কাজ এবং থিওরি অফ সিউডো ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর্স-এর ক্ষেত্রে নরসিমহনের রেজাল্ট। নরসিমহন ও সেশাদ্রি স্ট্যাবল ভেক্টর বান্ডলের ওপর একটি সেমিনার পেপার তৈরি করেন, যেটি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এমএস রঘুনাথন টিআইএফআর-এ বীজগাণিতিক ও ডিসক্রিট গ্রুপের গবেষণা শুরু করেছেন। শ্রী রঘুনাথন রিজিডিটি (কাঠিন্য)-র ওপর কাজ করে পরিচিতি পেয়েছেন।

স্কুল অফ ন্যাচারাল সায়েন্সেস্

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ধারাকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য ৭টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে।

পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে ড.ভাবা তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা বিভাগের গোড়াপত্তন করেন। তার গবেষণার ক্ষেত্র ছিল হাই এনার্জি ফিজিক্স এবং কমডেন্সড্ ম্যাটার ফিজিক্স। বিভাগটি এখনকার প্রধান বিষয় যেমন– গজ থিওরি, স্ট্রিং থিওরি, বিনর্মালাইজেশন ও সুপারকনডাকটিভিটি নিয়ে কাজ করে।

অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বিভাগে স্টেলার বাইনারি, গ্রাভিটেশনাল ওয়েভস্ এবং কসমোলজির মত ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে। টিআইএফআর ভারতের প্রথম গ্রাভিটি ওয়েভ ডিটেকটর নির্মাণকাজে নিয়োজিত। টিআইএফআর-এর হাই এনার্জি ফিজিক্স বিভাগ কেইকে, টেভাট্রন, এলইপি এবং এলএইচসি-র মত অতি গতিশীল প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত। টিআইএফআর পেলিট্রন পার্টিকেল এক্সেলেটর ফ্যাসিলিটিও পরিচালনা করছে। ভাবার উদ্যোগের ফলে সলিড স্টেট সমীক্ষার ক্ষেত্রে একটি এনএমআর স্পেকট্রোমিটার উদ্ভাবিত হয়। কনডেন্সড্ ম্যাটার ফিজিক্স ও ম্যাটেরিয়াল্ সায়েন্সেস্ বিভাগও উচ্চ তাপমাত্রার সুপারকনডাকটিভিটি, ন্যানোইলেকট্রনিক্স এবং ন্যানোফটোনিক্সের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্কুল অফ টেকনোলোজি এন্ড কম্পিউটার সায়েন্স

স্কুল অফ টেকনোলজি এন্ড কম্পিউটার সায়েন্স টিআইএফআর-এর প্রথম দিককার কাজের সময় গড়ে উঠেছিল। প্রতিষ্ঠার পরপরই বিভাগটি ডিজিটাল কম্পিউটার নির্মাণে হাত দেয়। এখন বিভাগটি অ্যালগরিদম, কমপ্লেক্সিটি থিওরি, ফরমাল মেথড, এ্যাপলাইড প্রোবাবিলিটি, ম্যাথমেটিক্যাল ফাইন্যান্স, ইনফরমেশন থিওরি, কমিউনিকেশন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস্

১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে ওবায়েদ সিদ্দিকী একটি মলিকিউলার বায়োলজি গ্রুপ হিসেবে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস্ বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করেন। এতদিনে আধুনিক বায়োলজির অনেক শাখায় প্রতিষ্ঠানটি তার কর্মকাণ্ড প্রসারিত করেছে। আধুনিক মলিকিউলার ও সেল বায়োলজির বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার জন্য বিভাগটির ১৪টি গবেষণাগার রয়েছে।

গবেষণা সুবিধা

ভারী আয়ন এটমিক ইন্টারঅ্যাকশন সমীক্ষার জন্য মধ্যম মাত্রার শক্তি উৎপানের জন্য ত্বরান্বিত করতে একটি লিনিয়ার পার্টিকেল এক্সেলেটর ও একটি পেলিট্রন ক্যাপাবল রয়েছে এবং কমপ্লেক্স মলিকিউল সমীক্ষার জন্য একটি পারমাণবিক চুম্বকীয় অনুনাদ সুবিধাও এ ক্যাম্প্যাসে রয়েছে। দাঁতের ওপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব নির্ধারণের জন্য প্রতিষ্ঠাটির একটি দন্ত বিভাগও রয়েছে। ক্যাম্পাস সুবিধা ছাড়াও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি ফিল্ড স্টেশন এবং গবেষণা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে। একটি বিরাটাকার মিটারওয়েভ রেডিও টেলিস্কোপ পুনের উত্তরে নারায়ণগাঁওয়ের কাছে গোবাদ এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম টেলিস্কোপ। এছাড়া তামিলনাড়ুর উধাগামণ্ডলমে একটি বিরাট ইকুয়েটোরিয়ালি মাউন্টেড সিলিনড্রিক্যাল রেডিও টেলিস্কোপ ও উচ্চ শক্তির কসমিক রে (মহাজাগতিক রশ্মি) ল্যাবরেটরি চালু রয়েছে। মধ্য প্রদেশের পাচমারিতে কাজ করছে ২টি উচ্চ শক্তির কসমিক রে ও গামা রে ল্যাবরেটরি। টিআইএফআর হায়দ্রাবাদে জাতীয় বেলুন ফ্যাসিলিটি পরিচালনা করেছে, যা পৃথিবীর মধ্যে সেরা এবং এটি ভূ-চুম্বকীয় নিরক্ষবৃত্তের সন্নিকটবর্তী হতে ভৌগোলিক সুবিধা প্রদান করছে। গৌরিবিদানুরে বিআইএফআর-বিজ্ঞানীরা মধ্যাকর্ষণ ও জড় ভরের পার্থক্য নিরূপণে একটি অসাধারণ স্পর্শকাতর নিক্তি নির্মাণ করেছেন।

গবেষণাগারের বাইরে টিআইএফআর-এর অন্যান্য গবেষণা সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে:

১. লাখ বই ও সাময়কীসমৃদ্ধ একটি পাঠাগার। পাঠাগারটি সম্পূর্ণ কম্পিউটাররাইজড্। এখান থেকে মাইক্রো ফিল্ম, মাইক্রোফিকে, অডিও-ভিডিও ও সিডি পাঠের সুব্যবস্থা আছে।
২. পরীক্ষা ও উপাত্ত বিশ্লেষণের ওপর গণনা, নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত ব্যক্তিগত কম্পিউটার ও কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার ব্যবস্থা।
৩. উচ্চগতির যোগযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গ্রিডের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী নেটওয়ার্ক।
৪. খুব কম তাপমাত্রার পরীক্ষণ সমীক্ষার জন্য তরল হিলিয়াম ব্যবস্থা।
৫. অতিশয় দামী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে একটি বিরাট ওয়ার্কশপ এবং কাচে ঘেরা অংশ।

এ প্রতিষ্ঠানের পথিকৃৎমূলক কাজের ফলে জাতীয় পর্যায়ে কয়েকটি নতুন সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এগুলির মধ্যে সোসাইটি ফর অ্যাপলাইড মাইক্রোওয়েভ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (এসএমইইআর) এবং ন্যাশনাল সেন্টার ফর সফট্‌ওয়ার টেকনোলজি (এনসিএসটি) উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আরো বিভিন্ন প্রকল্প, যার জন্য প্রতিষ্ঠানটির প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে, ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও শিল্প কারখানায় দেওয়া হয়েছে।

সূত্র **ইন্টারনেট**

অনুবাদ **মানসী চৌধুরী**

নিবন্ধ

পরিবেশ ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

হিমাদ্রিশেখর সরকার

ইংরেজি এনভায়রনমেন্ট শব্দটির আভিধানিক অর্থ চতুর্পার্শ্ব বা পরিবেশ বোঝালেও আধুনিক ইন্টারনেট-প্রযুক্তির যুগে শব্দটি ভূমি-পরিকল্পনা, শিল্প-নির্মাণ, যাতায়াত, জনসম্পদ, দূষণ ইত্যাদি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রমানসেও 'পরিবেশ' শব্দটির ব্যাপক তাৎপর্য আছে। বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ পরিবেশ ভাবনা থেকেও দূরে ছিলেন না। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনার কথা বলতে গিয়ে বিশেষ করে তাঁর প্রাকৃতিক পরিবেশ ভাবনার কথাই বলব।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উনিশ ও বিশ শতকে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সেরা চিন্তানায়কদের একজন। তাঁর চিন্তা-চেতনার জগত নিজের সমাজ ও রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকতায় স্থিত হয়েছিল। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি তথা মানবজীবনের চিন্তা-চেতনার প্রায় সকল দরজাতেই তিনি আঘাত করেছিলেন।

প্রখর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,

তাঁর এই 'চাওয়া-পাওয়া'য় পরিবেশের ভূমিকাই মুখ্য। 'পরিবেশ' অনুকূল না হলে তাঁর এই চাওয়া যে কখনও পাওয়ায় রূপ নেবে না তা তিনি ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের শুরুতে (১৯০১খ্রি.) কলকাতা থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে বীরভূম ('বির' মানে জঙ্গল, বীরভূম>জঙ্গলভূমি) জেলার বোলপুরের ভুবনডাঙায় পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন প্রাচীন ভারতের আশ্রম বা তপোবনের ধারণাকে সামনে রেখে। পরবর্তীকালে যার নাম হয় 'শান্তিনিকেতন'। যেখানে বাড়িগুলো হবে মাটির তৈরি, পাঠদান হবে গাছতলায়। পরিবেশ হবে গাছগাছালি সমৃদ্ধ 'ছায়া-সুনিবিড়'। রবীন্দ্রনাথ এভাবে মণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর 'শান্তিনিকেতন'। সেই মণ্ডনের মধ্যেই তাঁর পরিবেশচিন্তা সাকার হয়ে উঠেছিল। ঘটনাটা এমন একটা সময়ে ঘটেছিল যখন পরিবেশচিন্তা বলে কোনও বিষয় আধুনিক জগতের আর কোথাও সেভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি।

আজ যাকে আমরা পরিবেশ বলছি, যার বিষয়ে আজ সারা পৃথিবীর মানুষ মুখর হয়ে উঠেছেন, মহাকবি কালিদাস বর্ণিত (কালিদাস-এর 'রঘুবংশ' দ্রষ্টব্য, যার অনবদ্য অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং) প্রাচীন ভারতের তপোবনগুলোতে সেই পরিবেশের ব্যাপারটা ছিল মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়ানো। প্রকৃতির কথা তখন কেউ আলাদা করে ভাবতেন না। প্রকৃতির মধ্যেই তারা বাস করতেন। গাছপালা-পশুপাখিকে বাদ দিয়ে তাদের স্বতন্ত্র কোন জীবন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এমনই একটি পরিবেশ রচনা করলেন তাঁর শান্তিনিকেতন-এ।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে মানুষ হয়েছিলেন, সেই চিৎপুর-জোড়াসাঁকো অঞ্চলে কলকাতার নগরায়নের কুফলগুলো আজ থেকে শতাধিক বছর আগেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে সংবেদনশীল কবি যে 'নির্বাসিত' বোধ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী?

'সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের 'পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট–
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।' (বধূ:*মানসী*)

এই যে নির্বাসনের-বোধ, অন্যত্রও এর কথা কবি স্পষ্ট করে বলেছেন:

'But it always is a surprise to me to think that though this closed up hardness of a city was my only experience of the world. Yet my mind was constantly haunted by the home-sick fancies of an exile.'– A poet's school

এই যাঁর মনোজগতের পৃষ্ঠভূমি, মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পক্ষে প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ পটভূমির জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক নয় কি? তিনি গাছপালার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জীবনকে খুঁজে পেয়েছেন।

*বনবাণী*র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল।

কথাটা রবীন্দ্রনাথের জীবনে শুধু তত্ত্বকথা হয়ে থাকেনি। গাছপালা সম্পর্কে তাঁর যত গভীর আগ্রহ ও জ্ঞান ছিল তা খুব কম কবির মধ্যেই দেখা গেছে। এদিক দিয়ে কোন কবির সঙ্গে তুলনা করলে রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃতভাষার মহাকবি কালিদাসের এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আর তুলনায় কথাসাহিত্যিক হিসেবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আসতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই শুধু নয়, গদ্যরচনাতেও বৃক্ষ ও পরিবেশ-বন্দনার পরিচয় পাওয়া যায় ব্যাপকভাবে। আমরা জানি, এর বাস্তব ও জীবন্ত উদাহরণ হল শান্তিনিকেতন।

গাছপালার উপস্থিতি যে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল তা আজকাল যারা সাধারণবিজ্ঞান বা উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়েননি, তারাও বোঝেন। শুধুমাত্র দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকেই এটা বোঝা সম্ভব। উদ্ভিদ জগতের সহযোগিতা ছাড়া যে মানুষের প্রাণধারণ সম্ভব নয় একথা আজকাল সাধারণ মানুষও বুঝতে পারেন। আর ইতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে গাছপালার প্রয়োজন ও প্রভাব খুবই ব্যাপক এবং জটিল। গাছপালা থাকলে কীটপতঙ্গ আসে। সেই কীটপতঙ্গ এবং গাছের ফল-ফুলের টানে পাখিরা

আসে। এইভাবে যে জীবনচক্র বা লাইফ সাইকেল তৈরি হয় তা গোটা পরিবেশটাকে ধরে রাখে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে 'বসন্তোৎসব', 'বর্ষামঙ্গল' আর 'হালকর্ষণ' অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন এর মূলেও তাঁর পরিবেশ ভাবনা কাজ করেছে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বিভিন্ন উৎসবে যেমন ঐতিহ্য আর আধুনিকতা, মানুষ আর তার চারপাশের পরিবেশ স্থান পেয়েছে, তেমনি শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন ভবনের নির্মাণশৈলিতে তিনি পরিবেশ ভাবনায় স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। শান্তিনিকেতনের সব বাড়িতেই (যেমন- উত্তরায়ন, উদয়ন, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী ইত্যাদি) খোলা বারান্দা এবং চাতালের প্রাচুর্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই পরিবেশ ভাবনাকে গৃহস্থাপত্যে রূপায়িত করতে সাহায্য করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিংকর বেইজ, বীরেন্দ্রমোহন সেন, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কবিপুত্র) প্রমুখ শিল্পী ও বাস্তুকারেরা। একথাও অজানা নয় 'শ্রীনিকেতন'-এর প্রতিষ্ঠাও পরিবেশ ভাবনাকে সামনে রেখেই। মূলত রবীন্দ্র-পরিবেশচিন্তার পুরো ঝোঁকটাই ছিল ভবিষ্যতের দিকে। যার কারণে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মর্ম দেশবাসী সহসাই বুঝে উঠতে পারেননি।

'সভ্যতার প্রতি' রবীন্দ্রনাথের আহ্বান ছিল 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর'। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ নগরায়নের বিপক্ষে ছিলেন? আমরা তা মনে করি না। কারণ তিনি পৃথিবীর ৩০টিরও বেশি দেশ এবং শতাধিক নগর পরিক্রমা করেছিলেন। প্রায় সব জায়গায় তিনি পরিকল্পিত নগরায়ন দেখেছেন। তাঁর মত একজন আধুনিক মানুষের পরিকল্পিত নগরায়নের পক্ষে থাকাটাই স্বাভাবিক।

শতাব্দীব্যাপী পৃথিবীতে যে নগরায়ন হয়েছে তা তো হয়েই গেছে। এখন গোটা বড় শহরকে ভেঙে আবার নতুন করে গড়ে নেয়া সম্ভব নয়। তাই পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নতুন করে নগরকে দূষণমুক্ত করার কাজ চলছে। যেমন-শহরের কেন্দ্রস্থলের বিস্তীর্ণ এলাকায় মোটর গাড়ির চলাচল বন্ধ করে দিয়ে পায়ে হাঁটা এবং সাইকেল চালানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ আজ বেঁচে থাকলে এই ভাবনাকে সমর্থন করতেন। কারণ আমরা নগরায়নে এতদূর এগিয়ে গেছি যে ওখান থেকে আর 'অরণ্যে' ফেরা সম্ভব নয়। প্রযুক্তির প্রসার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পকারখানার বিস্তৃতি প্রভৃতি কারণে আগের অবস্থা বা অবস্থানে হুবহু ফিরে যাওয়ার বাস্তবতা নেই।

রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনার আলোকে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়তে হলে এমনভাবে নগর-পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ না ঘটে আবার নাগরিক-জীবনের সুখ-সুবিধাও বজায় থাকে। সারা দেশকে আমরা শান্তিনিকেতন-এর মত বাগানে (স্থানীয় আদিবাসী সাঁওতালেরা শান্তিনিকেতনকে বলতেন 'বাগান') পরিণত করতে পারব না (শান্তিনিকেতনও আগের সেই অবস্থায় নেই) একথা যেমন সত্য আবার এটাও মাথায় রাখতে হবে সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে হলে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনার বিকল্প নেই।

সূত্র: *রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান*, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ২০০০

হিমাদ্রিশেখর সরকার প্রাবন্ধিক, ব্যাংকার

ডালুর বিএসএফ কমান্ডার
ক্যাপ্টেন বালজিৎ সিং ত্যাগী

বিএসএফ প্রধান কে এফ রুস্তমজী

মুক্তিযুদ্ধ // ১

শেরপুরের যুদ্ধে বিএসএফ

এ এ জাফর ইকবাল

সত্তর সালের নির্বাচনের পর কেউ ধারণা করেনি যে পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ক্ষমতায় আসতে দেবে না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তাদের গণহত্যার পরিকল্পনাটিও তারা সম্পন্ন করে অত্যন্ত গোপনে। হামলা করে আকস্মিকভাবে। তাদের এই আক্রমণে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে পুরো বাঙালি জাতি। লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে যে-যেভাবে পেরেছে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।

মাসখানেক সময় বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেও একটা সময় তাদেরও ভারতে আশ্রয় নিতে হয়। সব ধরনের সহযোগিতার পথ অবারিত রাখলেও এত মানুষকে আশ্রয় দেয়ার মত প্রস্তুতি ভারতেরও ছিল না। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় সীমান্তের অপর পারে পরিমিত জনবসতি থাকার কারণে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভারতীয় প্রশাসন খুব সহজেই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। শেরপুরের ব্যাপারটি ছিল ব্যতিক্রম। সীমান্তের অপরপারে মেঘালয়ের গহীন অরণ্য। জনবসতিও খুব কম। ফলে পুরো চাপটাই পড়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষা বাহিনির (বিএসএফ) উপর। অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা দিয়ে শেরপুর সীমান্তে বিএসএফ পরিস্থিতি সামাল দেয়।

শেরপুর সীমান্তে মেঘালয়ের দায়িত্বে ছিল তখন বিএসএফ-র ১৮৩তম ব্যাটালিয়ান। কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর রঙ্গরাজন। সীমান্ত ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে পরিস্থিতির প্রয়োজনে তিনি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন অবিচলভাবে। সর্বভারতীয় বিএসএফ-র প্রধান ছিলেন তখন কে এফ রুস্তমজী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠজন হওয়ার সুবাদে রুস্তমজী সবসময় সীমান্তে তার সহকর্মীদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখেছেন। ব্যতিক্রম ঘটেনি শেরপুর সীমান্তেও।

শেরপুর সীমান্তে বিএসএফ-এর ছিল চারটি সীমান্ত চৌকি। প্রথমটি ডালুতে; কমান্ডিং অফিসার ছিলেন বালজিৎ সিং ত্যাগী। দ্বিতীয়টি চিচিংপাড়ায়; কমান্ডিং অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন বিনোদকুমার। চিচিংপাড়া কোম্পানি হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে আরেকটি সীমান্ত চৌকি ছিল পুরাকাশিয়ায়। তৃতীয় সীমান্ত চৌকিটি ছিল মহেন্দ্রগঞ্জে। এর কমান্ডিং অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন নেগী।

বাংলাদেশের রামচন্দ্রকুড়া থেকে কামালপুর পর্যন্ত শেরপুর সীমান্তে বিএসএফ বাঙালিদের অবাধে চলাচলের সুযোগ করে দেয় ২৮ মার্চ থেকে। ২৯ ও ৩০ মার্চ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের যোগাযোগ ঘটে বিএসএফ-এর সঙ্গে। ৩০ মার্চ বিকালে সুবেদার হাকিম যান চিচিংপাড়ায়, সুবেদার জিয়াউল হক যান ডালুতে। তারা বিএসএফ-এর কমান্ডিং অফিসারদের অনুরোধ করেন পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসতে। ৩০ মার্চ ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রফিকউদ্দিন ভূঁইয়ার চিঠি নিয়ে একটি প্রতিনিধিদল ভারতে যান এবং ডালুর কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন বালজিৎ সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ময়মনসিংহ সদরের এমএনএ অ্যাডভোকেট সৈয়দ আবদুস সুলতান। একই সময়ে রফিক ভূঁইয়া ডালুর বিএসএফ কমান্ডারকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করার জন্য আরেকটি চিঠি লেখেন।

নালিতাবাড়ির রামচন্দ্রকুড়া ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের সভাপতি ডালু বিএসএফ কমান্ডারকে লিখিতভাবে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে শেরপুরের এমএনএ অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান চিচিংপাড়ার বিএসএফ কমান্ডারকে অনুরোধ করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করার। এই সব অনুরোধের প্রেক্ষিতেই চিচিংপাড়া থেকে ক্যাপ্টেন কুমার ও ক্যাপ্টেন নেগী ইপিআরের সঙ্গে শেরপুরে আসেন। তারা শেরপুরে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরবর্তী সময়ে মধুপুরে যান মুক্তিবাহিনির রক্ষাব্যূহ পরিদর্শনে।

বিএসএফ কর্মকর্তারা মুক্তিবাহিনির রক্ষাব্যূহ পরিদর্শনের পাশাপাশি উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। যাদের সঙ্গে তারা কথা বলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আমেরিকার নাগরিক ফাদার ইউজিন হোমরিক ও সিস্টার প্রভাতী সাংমা। এদেরই পরামর্শে সীমান্তের উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলো মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফাদার ইউজিন হোমরিক নিজে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন ও শেরপুর সীমান্তে এসে বাউরামারি চার্চও পরিদর্শন করেন। তাঁকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তবে বিদেশী হওয়ার কারণে হত্যা করেনি।

যুদ্ধের শুরুতে ইপিআর-এর কাছে কোন বিস্ফোরক ছিল না। তাদের বিস্ফোরক সরবরাহ করে বিএসএফ। এই বিস্ফোরক দিয়েই ১৪ এপ্রিল মধুপুর ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৫ ও ১৬ এপ্রিল ময়মনসিংহ, জামালপুর ও দেওয়ানগঞ্জে পাকিস্তানি হেলিকপ্টার গানশিপ আকাশ থেকে ব্যাপক গোলাবর্ষণ করে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয়। শেরপুরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ নেতাদের কাছে অনুরোধ জানায় তাদের ভারতে চলে যাবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে। শেরপুর সংগ্রাম পরিষদ নেতৃত্ব কথা বলেন বিএসএফ-এর সঙ্গে। শেরপুর, শ্রীবর্দী, নকলা ও নালিতাবাড়িতে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে মাইকে ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়, যাঁরা যেতে চান তাঁরা যেতে পারেন। দলে দলে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ শুরু করে। শেরপুর জেলায় শতকরা ২০/২৫ শতাংশ জনবসতি ছিল সংখ্যালঘু।

২০ থেকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে অসংখ্য সংখ্যালঘু সীমান্ত অতিক্রম করে। তাদের সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিএসএফ। তারা অতি দ্রুত এদের অন্ন-সংস্থানেরও ব্যবস্থা করে।

২২ এপ্রিল থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে প্রবেশ শুরু করে। যারা অস্ত্র চালানো জানত এবং যাদের কাছে অস্ত্র ছিল তাদের পৃথক শিবিরে রেখে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পুরাকাশিয়ায় সুবেদার হাকিমকে এবং ডালুতে সুবেদার জিয়াউল হককে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়। যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক তরুণদের সমবেত করার জন্য দু'টি পৃথক ইয়ুথ ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়। ডালু ইয়ুথ ক্যাম্পের দায়িত্ব নেন অধ্যক্ষ মতিউর রহমান। পুরাকাশিয়া ইয়ুথ ক্যাম্পের দায়িত্ব নেন অ্যাডভোকেট আবদুল হালিম এমপিএ। পুরো বিষয়টি সমন্বয় করে বিএসএফ।

৩ মে মুক্তিবাহিনির প্রথম প্রশিক্ষণ শুরু করে এফ জে সেক্টর। এফ জে সেক্টরের ট্রেইনিদের পাঠানোর দায়িত্ব বর্তায় বিএসএফ-এর কাঁধে। এর মধ্যে ঘটে ভিন্ন এক বিপর্যয়। সীমান্তে আসা পাকিস্তানি সৈন্যরা সরাসরি আক্রমণ করে বসে ডালু ও কিল্লাপাড়া বিএসএফ ক্যাম্প। ২৫ মে ভোররাতে পানিহাতা বিওপি থেকে কিল্লাপাড়া আক্রমণ করে তারা ক্যাম্পের দখল করে নেয় এবং হেড কনস্টেবল মন বাহাদুর রাইসহ বিএসএফ-এর নয়জন সদস্য নায়েক কল্যাণ সিং নেগী, কনস্টেবল কুরধর সাইকিয়া, কনস্টেবল মন বাহাদুর ছেত্রী, কনস্টেবল প্রমোদ চন্দ্র কালিতা, কনস্টেবল মনভদ্র সিং, কনস্টেবল দেবেন্দ্র দত্ত বহুগুনা, কনস্টেবল পুরান বাহাদুর চাঁদ ও কনস্টেবল খোশ বাহাদুর চাঁদকে হত্যা করে। ঘটনার দু'দিন পর বিএসএফ কিল্লাপাড়া পুনরুদ্ধার করে। দ্বিতীয় দফা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন আসাম অঞ্চলের আইজি রণজিত সিং। যে নয়জন বিএসএফ সদস্য কিল্লাপাড়ায় শহীদ হয়েছেন তাদেরসহ কমান্ডেন্ট বালজিৎ সিং ত্যাগীকে কর্তব্য পালনের জন্য ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত করে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারও তাদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দিয়েছে।

জুন মাসের ৩ তারিখ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্তে আসতে থাকেন। শেরপুর সীমান্তে যাঁরা আসেন তাদেরকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ভাগ ডালুতে ক্যাপ্টেন বালজিৎ সিং ত্যাগীর তত্ত্বাবধানে, দ্বিতীয় ভাগ পুরাকাশিয়ায় ক্যাপ্টেন কুমারের তত্ত্বাবধানে এবং তৃতীয় ভাগ মহেন্দ্রগঞ্জে ক্যাপ্টেন নেগীর তত্ত্বাবধানে যুদ্ধ শুরু করেন।

এ সময় ছুটিতে চলে যান ক্যাপ্টেন কুমার। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ক্যাপ্টেন বি কে মুখার্জি।

মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রশিক্ষণ শেষে ৫টি ব্যাচে মুক্তিযোদ্ধারা শেরপুর সীমান্তে আসেন। সীমান্তে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিচক্ষণতার সঙ্গে দেখাশোনা করে বিএসএফ। দেশের ভেতরে থেকে যাঁরা সীমান্তে যুদ্ধ করতে গেছেন তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছে বিএসএফ। নভেম্বর মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনির সীমান্তে অবস্থান গ্রহণের আগে পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড তদারকি করত বিএসএফ।

৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হলে ক্যাপ্টেন বালজিৎ সিং ত্যাগী দু'টি কোম্পানি নিয়ে হালুয়াঘাট হয়ে ময়মনসিংহে আসেন। তিনি ময়মনসিংহ শহরের খাকডহরে অবস্থান নেন ৯ ডিসেম্বর গভীর রাতে। এই ইপিআর হেড-কোয়ার্টারেই তাঁর হাতে আটক হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনির ক্যাপ্টেন জামশেদসহ ১৮জন সৈনিক।

১০ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ পতনের পর ক্যাপ্টেন বালজিৎ বিএসএফ বাহিনি নিয়ে মিত্রবাহিনির সঙ্গে একীভূত হয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা হন। পথে প্রায় ২১টি ছোট-বড় যুদ্ধে অংশ নিয়ে ১৫ ডিসেম্বর রাতে তিনি কুর্মিটোলা পৌঁছন।

ক্যাপ্টেন বি কে মুখার্জি পুরাকাশিয়ায় থাকাবস্থায় একাধিকবার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নকশী আক্রমণে অংশ নেন। ৪ ডিসেম্বর তিনি শেরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ৮ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনির সঙ্গে একীভূত হন।

৪ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন নেগী কামালপুর হয়ে জামালপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি মিত্রবাহিনির সঙ্গে জামালপুরের যুদ্ধে অংশ নেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনি ও মিত্রবাহিনি যাদের কথাই বলা হোক-না কেন শেরপুরের যুদ্ধে বিএসএফ-এর অবদান অবিস্মরণীয়।

এ এ জাফর ইকবাল
মুক্তিযোদ্ধা, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার

উৎসব

বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসব

এস এম মুন্না

রাজধানীর ধানমণ্ডি শেখ কামাল আবাহনী মাঠে বসেছিল উপমহাদেশের প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের সবচেয়ে বড় মিলনমেলা। ২৬ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ দিন একের পর এক ধ্রুপদী সংগীতের সুরমূর্ছনায় ভেসেছিলেন হাজার হাজার শ্রোতা-দর্শক। শেষদিন শুদ্ধ সংগীতপিপাসুদের মন ছিল ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ন। এ ধরনের আরেকটি উৎসবের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে আগামী বছর পর্যন্ত। হৃদয়ে প্রশান্তির প্রলেপ ছোঁয়ানো প্রতিটি রজনী ছিল অনুপম শাস্ত্রীয় সংগীতে মোড়া। উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় ধ্রুপদ সুরের এই ঝরনাধারার সফল আয়োজন করে আমাদের ধন্য করেছেন বেঙ্গল ফাউন্ডেশন।

সংগীতপিপাসু মানুষকে ধ্রুপদ সুরের অনন্তলোকের সন্ধান দিতে ষষ্ঠবারের মত এ উৎসবের আয়োজন করে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন। প্রতিরাতে হাজার হাজার মানুষ শাস্ত্রীয় সংগীতের দিকপাল যশস্বী পণ্ডিত ওস্তাদ কিংবা বিদুষীদের কণ্ঠের মায়াজাল ও যন্ত্রসংগীতের সুরেলা ধ্বনির সঙ্গে উপভোগ করেছেন রূপরসে ভরপুর অপরূপ নৃত্যশৈলী। হৃদয়ে স্পন্দন জাগানো তবলার বোল, সন্তুরের মিহি সুর, সরোদের স্নিগ্ধ শব্দধ্বনি কিংবা অন্তরাত্মাকে আলোড়িত করা বাঁশির সুরে কেটেছে বিভোর সময়।

সুরের পথে ভ্রমণের এমন সুযোগ হাতছাড়া করেননি সংগীতপিয়াসী নগরবাসী। প্রতিদিনই সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত হাজার হাজার শ্রোতা-দর্শকের আগমনে রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে সরব আর উৎসবমুখর ছিল ঢাকার শেখ কামাল আবাহনী মাঠ।

'সংগীত জাগায় প্রাণ' স্লোগান ধারণ করে রাতজাগানিয়া পঞ্চ রজনীর এবার সুরের মেলার উদ্বোধন হয় ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার। শেষ হয় ৩০ ডিসেম্বর ভোরে হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার বাঁশির বিষাদের সুরের মধ্য দিয়ে। উদ্বোধনী রজনীর সূচনা হয় ড. এল সুব্রহ্মণ্যমের বেহালায় আভোগী রাগ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। মৃদঙ্গমে ছিলেন রামামূর্তি ধুলিপালা, তবলায় পণ্ডিত তন্ময় বোস এবং মোরসিং-এ ছিলেন সত্য সাঁই ঘণ্টশালা। এরপর মঞ্চে আসে উৎসবের নতুন সংযোজন আস্তানা সিম্ফনি ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা। দলটি প্রথমে তিলেস কাজগালিব রচিত একটি সিম্ফোনির কিছু অংশ এবং পি আই চাইকভস্কির অমর সৃষ্টি 'সোয়ান লেক'-এর কিয়দংশ পরিবেশন করে। আর্টিস্টিক ডিরেক্টর বেরিক বাত্যরখানের পরিচালনায় আস্তানা সিম্ফনি ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রার সঙ্গে কর্নাটকি বেহালার যুগলবন্দী পরিবেশন করেন ড. এল সুব্রহ্মণ্যম। তাঁরা দর্শক-শ্রোতাদের উৎসর্গ করে পরিবেশন করেন রাগ শান্তিপ্রিয়া।

রাত ১০টায় উৎসব উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, স্কয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী, আবাহনী লিমিটেডের সভাপতি সালমান এফ রহমান, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম আর এফ হোসেন এবং বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আবুল খায়ের।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের আয়োজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সবগুলো উৎসবে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি। এবারের উৎসব আয়োজন করতে স্থান নিয়ে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই আমি চাইব এ ধরনের জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য একটা নির্দিষ্ট এলাকা ঠিক করে দিতে।' আসাদুজ্জামান নূর বলেন, 'সংগীত পরিশুদ্ধ করে, অসাম্প্রদায়িক এবং মুক্তচিন্তার উদ্রেক করে, দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবাসতে শেখায়। এই উৎসব সেই চেতনার জাগরণ ঘটাবে এবং সাম্প্রদায়িক এবং অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে প্রেরণা জোগাবে।'

ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা উৎসবে নিজের সম্পূর্ণ বক্তব্য দেন বাংলায়। তিনি বলেন, 'এই উৎসব অসাম্প্রদায়িক এবং বহুসংস্কৃতির ধারক বাংলাদেশের মানুষকে আরও অনুপ্রাণিত করবে। ভারত ও বাংলাদেশের সাংগীতিক ঐতিহ্য একই উৎস থেকে প্রবাহিত।'

বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সভাপতি আবুল খায়ের বলেন, 'দেশে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব হলে দেশের মানুষ আরও মানবিক হবে। আর যতদিন পর্যন্ত আমরা রশিদ খাঁ, ড. এল সুব্রহ্মণ্যমের মত বড় মাপের শিল্পী তৈরি করতে না পারব ততদিন আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে না।' আগামীতে এই উৎসব ড. আবুল মাল আবদুল মুহিত, স্যার ফজলে হাসান আবেদ এবং ড. সনজীদা খাতুনকে উৎসর্গ করার ঘোষণা দেন আবুল খায়ের। উদ্বোধনী পর্বে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক, বিদুষী গিরিজা দেবী এবং বিদুষী কিশোরী আমনকরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উদ্বোধনী পর্ব শেষে সরোদ পরিবেশন করেন রাজরূপা চৌধুরী। পরিবেশন করেন রাগ অনিল মধ্যম। খেয়াল পরিবেশন করেন বিদুষী পদ্মা তালওয়ালকর। তিনি দেশ রাগে তারানা, মীরার ভজন এবং সব শেষে পরিবেশন করেন রাগ বাগেশ্রী। এরপর সেতার পরিবেশন করেন ফিরোজ খান। তিনি ঝিঁঝোটি রাগ ও ধুন পরিবেশন করেন। ফিরোজ খানের পর খেয়াল পরিবেশন করেন সুপ্রিয়া দাস। তিনি মালকোষ রাগে খেয়াল ও দেশ রাগে ঠুমরি পরিবেশন করেন। প্রথম দিনের আয়োজন শেষ হয় রাকেশ চৌরাশিয়ার বাঁশি ও পূর্বায়ন চ্যাটার্জির সেতারের যুগলবন্দীর মধ্য দিয়ে। শুরু করেন রাগ ললিত দিয়ে। পরে জোড়, ঝালা ও গৎ। দুই শিল্পী পরিবেশনা শেষ করেন রাগ ভৈরবীতে ধুন বাজিয়ে।

শান্তির বারতা দেয় শুদ্ধ সংগীত : পণ্ডিত যশরাজ

পণ্ডিত যশরাজের ভক্তকুল ভারতের সীমানা ডিঙিয়ে ছড়িয়ে আছে বিশ্বজুড়ে। বাংলাদেশেও কম নয়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে এর আগে একবার এসেছিলাম। তখনও শ্রোতাদের আগ্রহ দেখেছি ব্যাপক। এবার প্রথম বেঙ্গলের আমন্ত্রণে এলাম। ভালো লাগছে এই ভেবে যে, মার্গ সংগীত শোনার কান আরও তৈরি হয়েছে। শিল্পীও তৈরি হয়েছে। এটা আয়োজকদের একটা বিরাট সাফল্য। পণ্ডিত যশরাজ বলেন, 'শান্তিতে না থাকলে 'সুর' সৃষ্টি হয় না। শান্তিই সুর সৃষ্টির অন্যতম রসদ। সবাই এখন শান্তিতে আছি। তা না হলে বছর বছর উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসবের আয়োজন কেন হবে?' শান্তির বারতা দেয় এই উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসব। তিনি বলেন, বাংলাদেশের আতিথেয়তায় তিনি মুগ্ধ। বাংলাদেশি খাবারের মধ্যে আলুভর্তা হচ্ছে তার প্রিয় খাবার। পণ্ডিত যশরাজ ২০০০ সালে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব 'পদ্মবিভূষণ' অর্জন করেন। পদ্মভূষণ পান ১৯৯০ সালে। আর পদ্মশ্রী লাভ করেন ১৯৭৫ সালে।

দ্যুতি ছড়ালেন শিবকুমার শর্মা

দ্বিতীয় দিনের আয়োজনের শুরুতেই কত্থক নৃত্য পরিবেশন করেন অদিতি মঙ্গলদাস ড্যান্স কোম্পানি ও দৃষ্টিকোণ ড্যান্স ফাউন্ডেশন। পরিবেশনাটি সাজানো হয় তিনটি পর্বে। উৎসব, পরম বা প্রিয়তমের খোঁজে এবং তারানা। প্রধান নৃত্য শিল্পী ছিলেন অদিতি মঙ্গলদাস। তাঁর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন গৌরী দিবাকর, মিনহাজ, আম্রপালি ভাণ্ডারী, অঞ্জনাকুমারী, মনোজকুমার, সানি শিশোদিয়া। কণ্ঠ ও হারমোনিয়াম পরিবেশনে ছিলেন ফারাজ খান, তবলা ও পাঢ়ানে মোহিত গাঙ্গানি, পাখোয়াজ ও পাঢ়ান্তে আশিস গাঙ্গানি, বাঁশিতে রোহিতপ্রসন্ন। উৎসব পর্বের মূল পারকাশন রচনা করেন গোবিন্দ চক্রবর্তী এবং শ্লোক লেখেন সামিউল্লাহ খান। 'প্রিয়তমের খোঁজে' পর্বে ওস্তাদ আমির খসরুর সংগীতভাষ্যে সংগীত রচনা করেছেন সামিউল্লাহ খান। তারানা পর্বের সংগীত রচনা করেছেন শুভা মুদগাল ও অনীশ প্রধান।

এদিন সুরেশ তলওয়ালকরের পরিচালনায় তবলা পরিবেশন করে বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়। তবলা দলে ছিলেন প্রশান্ত ভৌমিক, সুপান্থ মজুমদার, এম জে জেসাস ভুবন, ফাহমিদা নাজনিন, নুসরাত-ই-জাহান এবং শ্রেষ্ঠা প্রিয়দর্শিনী। পরিবেশনা শেষে শিল্পীদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন ভারতীয় হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।

এর পর মঞ্চে এসে দ্যুতি ছড়ালেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সন্তুর শিল্পী পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা। তিনি পরিবেশন করেন রাগ ঝিঁঝোটিতে আলাপ, জোড়, ঝালা ও গৎ। তবলায় ছিলেন যোগেশ শামসি ও তানপুরায় তাকাহিরো আরাই। খেয়াল পরিবেশন করেন পণ্ডিত উলহাস কশলকর। শুরু করে রাগ যোগকোষ দিয়ে আর শেষ করেন সোহিনী রাগে। সেতার পরিবেশন করেন ওস্তাদ শাহিদ পারভেজ খাঁ। তিনি শোনান বাগেশ্রী রাগ। দ্বিতীয় দিনের আয়োজন শেষ হয় পণ্ডিত রণু মজুমদার (বাঁশি) এবং পণ্ডিত দেবজ্যোতি বোস (সরোদ)-এর যুগলবন্দি পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। শিল্পীদ্বয় পরিবেশন করেন রাগ আহীর ভৈরব। দর্শকদের অনুরোধে তারা ভাটিয়ালী ধুন পরিবেশন করেন।

ঈশ্বরকে পেতে সাধনার মধ্যে থাকতে হবে – পদ্মভূষণ বিদ্বান ভিক্ষু বিনায়ক রাম

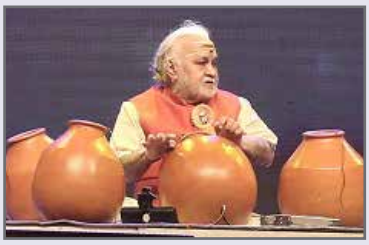

উচ্চাঙ্গসংগীতের তৃতীয় রজনীতে গ্র্যামি বিজয়ী পদ্মভূষণ বিদ্বান ভিক্ষু বিনায়ক রাম ঘটমবাদ্যের সুরে টালমাটাল ছিলেন অর্ধলক্ষাধিক সংগীতপিপাসু। ভিক্ষু বিনায়ক রাম বলেন, 'ঈশ্বরকে পেতে সাধনার মধ্যে থাকতে হবে। বাদ্যযন্ত্রের সুর সেই ছোটবেলা থেকে ঐশ্বরিক সুখ দিয়ে আসছে। বংশপরম্পরায় এই চর্চা করছি। ধ্বনিতে সুরের জন্ম, তালে তা গতিময় হয়, প্রকাশন পর্বে প্রাণসঞ্চার হয় ঘটমে। তালের আদিরূপ পরিস্ফুট হয় বাদ্যের সুর-তালে। এটাই আমার আত্মার খোরাক।'

গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বিনায়ক রাম। পেয়েছেন 'পদ্মভূষণ' খেতাব। এর পরও তার মধ্যে কোন অহংবোধ দেখা গেল না। বিনয়ের সঙ্গে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন বিদ্বান ভিক্ষু বিনায়ক রাম। তিনি জানালেন, যেখানে আমন্ত্রণ পান, একা যান না। ছেলে সেলভাগনেশ বিনায়ক রাম এবং পৌত্র স্বামীনাথনও তার সঙ্গে সংগীতসফরে বের হন। তার উদ্দেশ্য থাকে, এক মঞ্চে তিন প্রজন্মের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের কাছে বাদ্যযন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন রূপ-রস-গন্ধ ঢুকিয়ে দেওয়া। এত বড় আয়োজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বিনায়ক রাম বলেন, 'সময়-সুযোগ পেলে বাংলাদেশে এসে আবার ঘটমের বাদ্য-তাল শুনিয়ে যাব।'

গ্র্যামি বিজয়ী পদ্মভূষণ বিদ্বান ভিক্ষু বিনায়ক রামের ঘটমতাণ্ডব

তৃতীয় দিন দলগত সেতার বাদন পরিবেশন করেন বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়ের শিক্ষার্থীরা। সেতার দলে ছিলেন প্রসেনজিৎ মণ্ডল, টি এম সেলিম রেজা, রিংকু চন্দ্র দাস, মেহরিন আলম, জ্যোতি ব্যানার্জি, মোহাম্মদ কাউসার এবং জাহাঙ্গীর আলম শ্রাবণ। পণ্ডিত কুশলকুমার দাসের কম্পোজিশনে তারা কিরওয়ানি রাগে সেতার অর্কেস্ট্রা পরিবেশন করেন।

ঘটম ও কাঞ্জিরা পরিবেশনা নিয়ে মঞ্চে আসেন গ্র্যামি বিজয়ী পদ্মভূষণ বিদ্বান ভিক্ষু বিনায়করাম। সঙ্গে ছিলেন তার ছেলে সেলভাগনেশ বিনায়করাম ও পৌত্র স্বামীনাথন। তাদের সঙ্গে মরসিংয়ে ছিলেন এ গণেশন। নিজেদের পরিবেশনার তারা ঘটমে শিব তাণ্ডব, সেভেন অ্যান্ড হাফ বিট কম্পোজিশন বাজান। পরে তারা গুরুবন্দনা ও গণপতি তাল বাজিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। ঘটম ও কাঞ্জিরার পর ড. ফকির শহীদুল ইসলাম ও জি এম সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় খেয়াল পরিবেশন করে সরকারি সংগীত কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা

গান সস্তা কোন জিনিস নয় : পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী

'প্রশংসা করার মতো অনেক প্রতিভা রয়েছে এ বাংলাদেশের ভূখণ্ডে। যাকে আমি বলি স্বর্গীয় কণ্ঠসম্পন্ন সম্পদ হিসেবে। শুধু রত্নটা খুঁজে বের করতে হবে। তবে এই সংগীত ভালভাবে শেখানোর লোকের অভাব রয়েছে। উৎসাহ দেওয়ারও অভাব রয়েছে। বেঙ্গল ফাউন্ডেশন বছর বছর উচ্চাঙ্গসংগীতের আয়োজন করে আসছে বলে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। শোনার জন্য 'কান' তৈরি হয়েছে। এ কারণেই শিক্ষা নেওয়ার জন্য আগ্রহীদের সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন। তিনি বলেন, 'সস্তা জিনিসের দাম সস্তাই হয়। গান হচ্ছে সেই জিনিস, সস্তাভাবে চর্চা করলে সস্তার মতই ফল হবে। একবার শুনলে দ্বিতীয়বার শোনার আগ্রহ থাকে না। শ্রমের দাম চুকাতে সংগীতের মধ্যে নিজেকে ডুব দিয়ে থাকতে হবে। রাগ-রাগাশ্রীর সন্ধান করতে হবে অন্তর দিয়ে। 'স্বর' দিয়ে রাগ হয় না, সুর দিয়ে রাগ হয়– এটা মনে রাখতে হবে। উচ্চাঙ্গসংগীত শোনার জন্য তরুণ প্রজন্ম গড়ে উঠেছে। এটা সুখের কথা। কারণ আমরা যারা বুড়ো হয়ে গেছি, আর ক'দিন বাঁচব। তরুণরাই তো গানের হাল ধরে রাখবে।'

পরিবেশন করেন রাগ মালকোষ। সরোদ পরিবেশন করেন শিল্পী আবির হোসেন। তিনি পরিবেশন করেন রাগ আভোগী। বাঁশি বাদন নিয়ে মঞ্চে আসেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত বংশীবাদক গাজী আবদুল হাকিম। তিনি দেশ রাগ, পিলু ঠুমরী ও কয়েকটি ধুন পরিবেশন করেন শ্রোতাদের জন্য। তার সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেন দেবেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, এবং তানপুরায় সঙ্গত করেন বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়ের শিক্ষার্থী সামীন ইয়াসার ও এস এম আশিক আলভি। বাঁশির পর ধ্রুপদ সংগীতে দর্শকদের মোহিত করেন শাস্ত্রীয় সংগীতের সনাতন ধারার বিশিষ্ট পণ্ডিত উদয় ভাওয়ালকর। তিনি পরিবেশন করেন রাগ মাড়ু ও রাগ তিলং। ধ্রুপদ পরিবেশনাটি শেষে গায়কী অঙ্গের বেহালা বাদন নিয়ে মঞ্চে আসেন বিদুষী কলা রামনাথ। তিনি পরিবেশন করেন রাগ নট ভৈরব, এবং রাগ বসন্ত। উৎসবের তৃতীয় দিনের শেষ পরিবেশনাটি ছিল পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর খেয়াল। শুরু করেন রাগ গুণকেলি দিয়ে আর শেষ করেন ভজন পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। এর মাঝে পরিবেশন করেন যোগিয়া রাগ।

এবারও রাশিদ খানে উল্লসিত শ্রোতা

চতুর্থ দিনের আয়োজন শুরু হয় বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের দলগত নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। 'নৃত্য চিরন্তন: মণিপুরি, ভরতনাট্যম, কত্থক নৃত্যার্ঘ' শীর্ষক দুই পর্বে ভাগ করা এ পরিবেশনাটির নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন গুরু বিপিন সিংহ, পণ্ডিত বিরজু মহারাজ, শিবলী মহম্মদ। নৃত্য ভাবনা, সার্বিক নৃত্য পরিচালনা ও সমন্বয়কারী ছিলেন শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম পর্বে পরিবেশিত হয় মণিপুরি, ভরতনাট্যম, কত্থক নৃত্যের উপস্থাপনা। মণিপুরি নৃত্যে তাল-তানচেপ-৪ মাত্রায় রাধা রূপ বর্ণনা করেন সুদেষ্ণা স্বয়ম্প্রভা। নৃত্য ও সংগীত পরিচালনায় ছিলেন গুরু বিপিন সিংহ ও কণ্ঠে গুরু কলাবতী দেবী। ভরতনাট্যম অংশে কীর্তি রামগোপালের নৃত্য পরিচালনায় ও ডি এন শ্রীবৎসর সংগীত পরিচালনায় বৃন্দাবনী রাগ ও আদি তালে সূরিয়া কথুরাম পরিবেশন করেন অমিত চৌধুরী। এরপর শিব স্তুতি পরিবেশন করেন জুয়েইরিয়াহ মৌলি। শিব স্তুতিটি পরিবেশিত হয় আভোগী রাগে মিশ্র চাপু তালমে। কীর্তি রামেগাপালের নৃত্য পরিচালনায় ও শ্রী পদ্মচরণের সংগীত পরিচালনায় এবং পূর্বী কল্যাণী রাগে ও আদি তালমে শিব কৃতি পরিবেশন করেন অমিত চৌধুরী। কত্থক নৃত্যের শুরুতে তিনতালে গুরু বন্দনা করেন মেহরাজ হক তুষার। শুদ্ধ নৃত্য পরিবেশন করেন স্নাতা শাহরিন। তিনতালের ওপর ভিত্তি করে পরিবেশিত এ কত্থক নৃত্যের সংগীত ও নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন শিবলী মহম্মদ। শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিচালনা ও রাহুল চ্যাটার্জির সংগীত পরিচালনায় (রবীন্দ্রসংগীত) এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব। এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে মণিপুরি, ভরতনাট্যম ও কত্থক সম্মিলনে নটরাজের প্রতি নৃত্যের মালিকা নিবেদন করা হয়।

নৃত্যের পর সরোদ পরিবেশন করে বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়। শিক্ষার্থীরা রাগ ভূপালি পরিবেশন করেন। এরপর মঞ্চ আলোকিত করেন উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ওস্তাদ রাশিদ খান। রামপুর-সহসওয়ান ঘরানার প্রবাদপ্রতিম এই শিল্পী পুরিয়া রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। কণ্ঠ সহযোগী ছিলেন নাগনাথ আদগাঁওকার।

খেয়াল শেষে ছিল সরোদ-বেহালার যুগলবন্দী। পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এবং ড. মহীশূর মঞ্জুনাথ একসঙ্গে পরিবেশন করেন রাগ সিমেন্দ্রমধ্যমম। এরপর খেয়াল পরিবেশন করেন পণ্ডিত যশরাজ। তিনি প্রথমে রাগ যোগ, পরে দুর্গা রাগে ভজন পরিবেশন করেন।

প্রথমবারের মত এই উৎসবে চেলোর

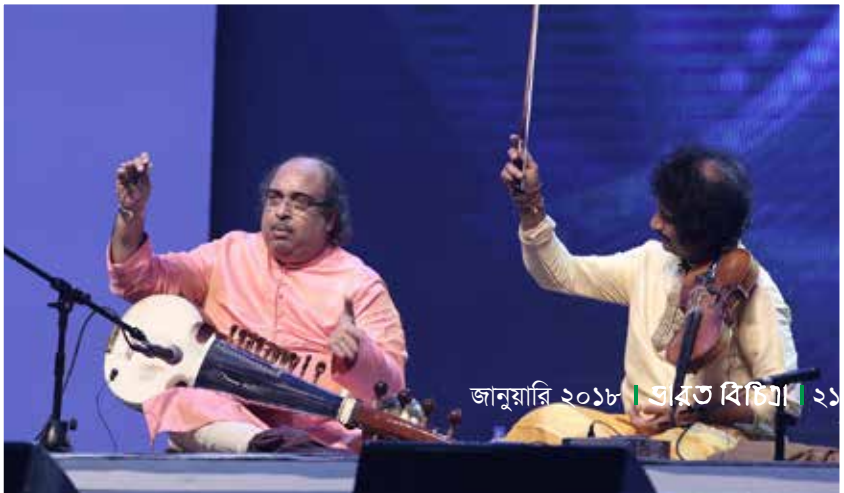

পরিবেশনা নিয়ে মঞ্চে আসেন সাসকিয়া রাও দ্য-হাস। তিনি রাগ নন্দকোষ পরিবেশন করেন। 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' ও 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'– এ দু'টি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। চতুর্থ দিনের শেষ পরিবেশনা ছিল ইমদাদখানি ঘরানার শিল্পী পণ্ডিত বুধাদিত্য মুখার্জির সেতার। তিনি রাগ ললিত বিস্তার গৎ ঝালা পরিবেশন করেন।

বিষাদের সুর...

উৎসবের পঞ্চ ও সমাপনী রজনীর শুরু হয় নৃত্য দিয়ে। আর শেষ হয় ভোরে হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার বাঁশিতে বিষাদের সুরের মধ্য দিয়ে। সন্ধ্যায় মঞ্চ আলোকিত করেন বিদুষী সুজাতা মহাপাত্র ওড়িশি নৃত্য দিয়ে। পরিবেশনাটি ছিল অর্ধনারীশ্বর ও রামায়ণ-লঙ-এ দুই পর্বে বিভক্ত। সুজাতা মহাপাত্রের সহশিল্পী ছিলেন সৌম্য বোস।

ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে উৎসবের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক স্যার ফজলে হাসান আবেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ছায়ানটের সভাপতি ড. সনজীদা খাতুন, ইমপ্রেস টেলিফিল্ম ও চ্যানেল আই-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর এবং আবাহনী লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী নাবিল আহমেদের মা আমিনা আহমেদ। আনিসুজ্জামান বলেন, 'প্রতি বছর এই উৎসব নিজেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এটা গর্বের ব্যাপার।'

শাস্ত্রীয় সংগীতের মূল শিকড় এই বাংলাদেশে – পণ্ডিত দেবজ্যোতি বোস

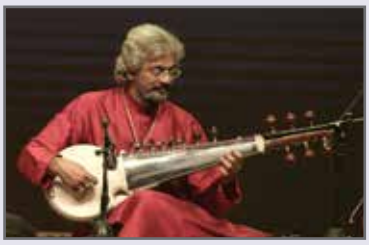

গোলাম বন্দেগি খান বাঙ্গাস ঘরানার সরোদ বাজিয়ে ভারতীয় প্রখ্যাত পণ্ডিত দেবজ্যোতি বোস। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সরোদ বাজিয়েছেন তিনি। তবে বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসবে এসেছেন এবারই প্রথম। অবশ্য ২০১১ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির একটি উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন বড় ভাই কুমার বোসের সঙ্গে। রাজধানীর ধানমণ্ডির শেখ কামাল আবাহনী মাঠে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন আয়োজিত পঞ্চ রজনীর ষষ্ঠ উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসবের দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় অধিবেশনের সর্বশেষ পরিবেশনায় অংশ নেন তিনি। 'কেন যে হিন্দুস্তানি বা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত বলা হয়, তা বুঝি না। কারণ প্রায় ৬০ শতাংশ সংগীতগুরুরই মূল শিকড় এই বাংলাদেশে।' এই লেখকের কাছে সাক্ষাৎকালে পণ্ডিত দেবজ্যোতি বোস এ কথা বলেন। জানালেন, উচ্চাঙ্গসংগীত সাধনায় স্বর্গীয় আনন্দ পাওয়া যায়।

সমাপনী আলোচনা অনুষ্ঠানের পর আবার শুরু হয় বাদন পরিবেশনা। এবার মোহনবীণা পরিবেশন করেন পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভট্ট। তিনি রাগ মরু বেহাগ ও ধুন পরিবেশন করেন। খেয়াল পরিবেশন করেন ব্রজেশ্বর মুখার্জি। তিনি রাগ যোগ পরিবেশন করেন। এরপর তিনি একটি ঠুমরী পরিবেশন করেন। সেতারে যুগলবন্দী পরিবেশন করেন পিতা-পুত্র পণ্ডিত কুশল দাস ও কল্যাণজিৎ দাস। পরিবেশন করেন যোগ কোষ। এরপর খেয়াল পরিবেশন করেন পণ্ডিত কৈবল্যকুমার। রাগ গোরখ কল্যাণ ও খাম্বাজ রাগে ঠুমরী পরিবেশন করেন তিনি।

বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসবের সমাপ্তি হয় পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার বাঁশির সুরে। তিনি প্রথমে রাগ ললিত এবং পরে জনপ্রিয় লোকসুর পরিবেশন করেন। শেষ করেন পাহাড়ি ধুন দিয়ে। শিল্পীকে বাঁশিতে সঙ্গত করেন বিবেক সোনার ও ইউকা নাগাই।

অন্যান্য আয়োজন

সংগীত উপভোগের পাশাপাশি পাঁচদিনে এ আয়োজনে উৎসব প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের সংগীত সাধক ও তাদের জীবনী নিয়ে একটি সচিত্র প্রদর্শনী এবং বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেকচার, ল্যান্ডস্কেপস অ্যান্ড সেটলমেন্টস এর 'সাধারণের জায়গা' শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসব ২০১৭-এর নিবেদক ছিল স্কয়ার গ্রুপ। আয়োজন সমর্থন করে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, অনুষ্ঠানে সম্প্রচার সহযোগী চ্যানেল আই। ইভেন্ট ব্যবস্থাপনায় ছিল ব্লুজ কমিউনিকেশনস। উৎসবের সার্বিক সহযোগিতায় ছিল সিঙ্গাপুরের পারফেক্ট হারমনি।

গত পাঁচ বছর ধরে আয়োজিত বেঙ্গল উচ্চাঙ্গসংগীত উৎসব শিল্পী ও দর্শকের অংশগ্রহণের নিরিখে এরই মধ্যে উপমহাদেশ তথা বিশ্বের সর্বাধিক বড় পরিসরের উচ্চাঙ্গসংগীতের আসর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। উৎসব উৎসর্গ করা হয় বরেণ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক ও সংস্কৃতিতাত্ত্বিক ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানকে।

এস এম মুন্না সাংবাদিক

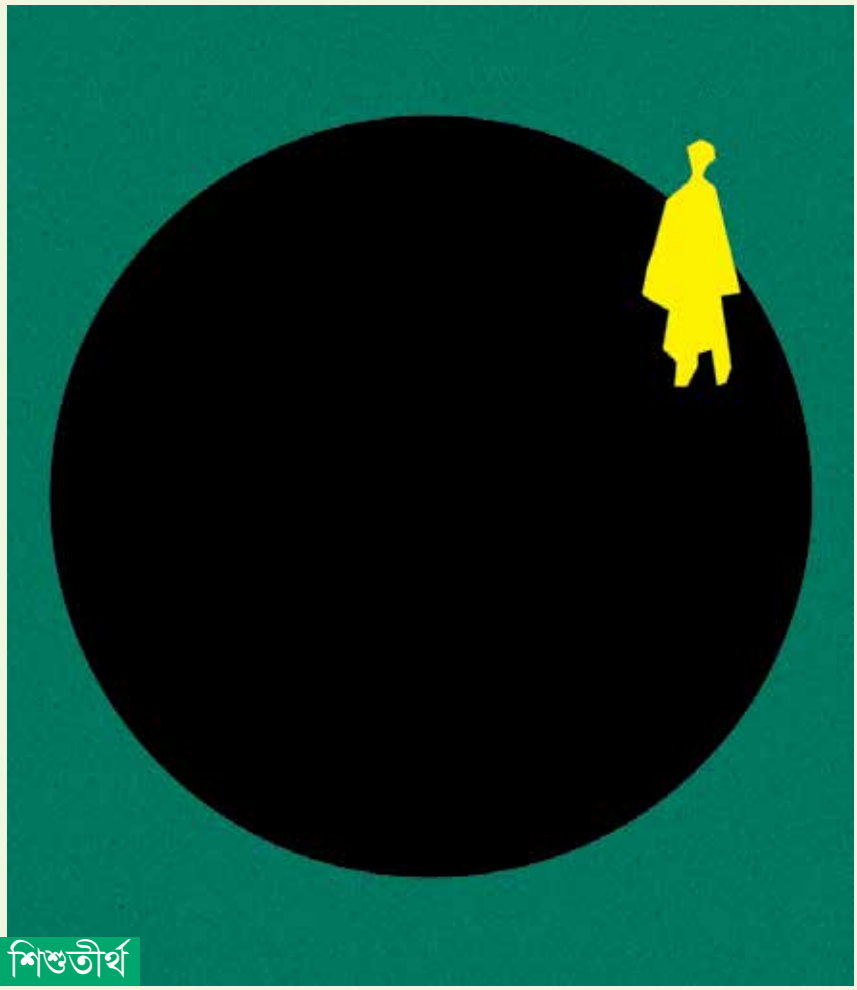

শিশুতীর্থ

হরিয়ানার লোককাহিনি

রূপোর কূপ

ছোট্ট একটি গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করত এক ধূর্ত আর হিংসুটে লোক। ধূর্তামি করাই ছিল তার পেশা। আর এভাবেই কামাই করত সে অনেক অনেক টাকা।

'আমি কেন পরিশ্রম করতে যাব! আমার তো ধূর্তামি করার যোগ্যতা আছে', ভাবত সে।

ধূর্ত লোকটি একজন বোকা কৃষকের কাছে গিয়ে বলল, 'আমার এত সম্পদ আছে যে সেগুলো ভালভাবে দেখভাল করতে পারিনে। আমি আমার কিছু জমি বিক্রি করতে চাই।'

কৃষকটির জমির দরকার ছিল। আর তাই সে একপায়ে খাড়া হয়ে গেল, 'জমি কিনব। তবে তার আগে তো জমিটা একবার পরখ করে দেখা দরকার।'

'অবশ্যই দেখবে!' ধূর্ত লোকটি বলল, 'তো চল আমার পিছনে পিছনে। আচ্ছা পিছনে নয়, পাশাপাশি হাঁটা যাক, কী বলো!' বলেই একচিলতে হাসি ছুড়ে দিল কৃষকের মুখের উপর।

বিশাল জমির একপাশে ছিল একটি কুঁড়েঘর ও একটি কূপ।

'এই কুঁড়ে ঘর আর কূপটি ও বিক্রি করা হবে। কিন্তু কূপটির দাম সবচেয়ে বেশি।' ধূর্ত লোকটি বলল। দামের কথা শুনে কৃষকের চক্ষু চড়কগাছ।

'কী এমন মূল্যবান জিনিস আছে এই কূপের ভেতর?' কৃষক অবাক হয়ে বলল।

'রূপোর কূপ। কূপের মধ্যে আছে প্রচুর রূপো।' ধূর্ত লোকটি উত্তর দিল।

লোকটি তাকে কূপের কাছে নিয়ে গেল। কূপ থেকে তুলল একবালতি রূপো।

'দেখ, দেখ। যতবার তুমি বালতি টেনে তুলবে ততবারই রূপো পাবে তুমি। আর এ কারণেই কূপটির এত দাম।' বলল সে।

বিষয়টি দেখে কৃষক দারুণ উত্তেজিত।

'কূপটি কিনলে আমার আর অভাব থাকবে না। অনেক ধনী হয়ে যাব আমি', ভাবল কৃষক। 'তা কত দাম কূপটির?' কৃষক জিজ্ঞাসা করল।

'যদি দামের কথা জিজ্ঞাসা কর তবে বলব, একশো স্বর্ণমুদ্রা। তুমি আমার বন্ধু বলে পঁচিশ ছাড়। তার মানে মোটে পঁচাত্তর স্বর্ণমুদ্রা।' ধূর্ত লোকটি বলল।

বোকা কৃষক বলল, 'বেশতো! পঁচাত্তর স্বর্ণমুদ্রা এমন আর কী?'

মুদ্রা আনতে বাড়ির দিকে পা বাড়াল সে। ধূর্ত লোকটিও তাকে অনুসরণ করল। দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির বাইরে। কৃষকের স্ত্রী ছিল খুবই বুদ্ধিমতী। 'এই রূপোর কূপ নিয়ে আমার সন্দেহ আছে', সে জিজ্ঞাসা করল, 'তা কত দাম পড়বে তোমার রূপোর কূপের? টাকা পরিশোধ করার আগে গ্রামের লোকজনদের সাথে একটু পরামর্শ করা ভাল।' মাথা নেড়ে সায় দিল কৃষক। তারপর ধূর্ত লোকটার কাছে গিয়ে সে নম্র স্বরে বলল, 'দয়া করে আমাকে একদিন সময় দাও। কাল সকালে একবার এস। আমি টাকা জোগাড় করে রাখব।'

কৃষক ফাঁদে পড়ে গেছে। আনন্দে বগল বাজাতে বাজাতে ধূর্ত লোকটি ফিরে এল বাড়িতে।

কৃষক একজন জ্ঞানী লোকের কাছে গিয়ে তার অভিপ্রায় জানাল।

'রূপোর কূপ! বাব্বা! কাল যখন লোকটি তোমার বাড়িতে আসবে তখন তাকে বল ঐ রূপার কূপটি তার নিজের এবং পঁচাত্তর স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কূপটি তোমার নামে লিখে দিচ্ছে। যদি সে লিখিত দিতে না চায় তবে তাকে শুধু মাত্র দশ স্বর্ণমুদ্রা দেবে। যদি সে প্রকৃত বিক্রেতা হয় তবে সে তোমাকে লিখিত দেবে। আর যদি সে প্রতারক হয় তবে সে ঐ দশেই তোমার কাছে বিক্রি করবে।' উপদেশ নিয়ে কৃষক তার বাড়িতে ফিরে এল।

পরদিন ধূর্ত সেই লোকটি যথারীতি কৃষকের বাড়িতে এলে কৃষক বলল, 'আমি তোমার রূপোর কূপ কেনার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু বিনিময়ে আমাকে তুমি লিখিত কিছু দেবে যে পঁচাত্তর স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে এটি তুমি আমার কাছে বিক্রি করছ। আর এই কূপ থেকে রূপা পাওয়া যাবে।'

কথা শুনে সতর্ক হয়ে গেল ধূর্ত লোকটি। হো হো করে হেসে বলল, 'আরে, তুমি তো আমার প্রাণের বন্ধু। এর চেয়ে আরও অনেক কিছু দিতে পারি।'

'তুমি যে আমার প্রাণের বন্ধু সেটি আমিও মনে করি। তাহলে দশ স্বর্ণমুদ্রায় কূপটি আমাকে দিয়ে দাও', বলল কৃষক।

'তুমি যাতে খুশি আমিও তাতে রাজি। তাহলে দশ স্বর্ণমুদ্রাই আমাকে দাও', হাসতে হাসতে বলল ধূর্ত লোকটি।

কৃষক বুঝতে পারল যে, লোকটি তাকে ধোকা দিতে চাইছে। লোকটিকে সে ধরে গ্রামের সবচেয়ে ষণ্ডামার্কা লোকের হাতে তুলে দিল।

ধূর্ত লোকটির দুই গালে দু'চারটি যুতসই চড়-থাপ্পড় পড়তেই সে ভাল হয়ে গেল। ভাল হয়ে গেল একেবারে রত্নাকর দস্যুর মত।

ভাষান্তর
বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান

নদীটিকে চিনিনি আমি

সন্তোষ ঢালী

নদীটিকে চিনিনি আমি
সে চিনেছে বোঝা গেল আনত চোখে,
শুধাই কাছে গিয়ে বিলম্বিত লয়ে– কাউকে কি ভালবাস তুমি?
মৃদু হেসে– আর কিছু বলার দরকার নেই– চল বাড়ি যাই–
ওটুকু হাসিতে ধরে এক জীবনের পথ চিরকালের সম্মতি,
হাত ধরে হেঁটে যায় নদী– তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে– নাচে মেঠোপথ
বুকে যেন স্বর্গ ঝুলানো আকাশগঙ্গার পারে।
ভাসিয়ে নিয়ে চলে নদী স্বপ্নের ভেলায়–
সমাজ-সংসার রীতি-নীতি তুচ্ছ সকল খড়কুটোর মত
পাড় ভাঙে নদীর টানে রাতের ছলনায়।

শীতের ভোরে দুর্গম কুয়াশায় নদীটি উধাও
হায় নদী, ছলনা নয় জানি, তবু
বাস্তবতা মেনে নেয়া ভার–
দারুণ শীতেও কি ফোটে না কোন ফুল শুকনো শাখায়?
কোকিল কি ডাকে না ভুলে বসন্ত গেলেও সরে দূরে?
কুয়াশার চাদর ঠেলে নদী তুমি আবার হাসো
আবার শুধু একবার হাত ধরে বল–
আর কিছু বলার দরকার নেই–
চল বাড়ি যাই– হোক সে ঘুমের ভেতর–

অমন করে না ফেরার দেশে, শোন, যেও না গো নদী
আশ্বাস দিলে বিষ্ণুর মত আমিও ঘুমোব অনন্ত ঘুমে–
একবার শুধু আর একবার ফিরে এস স্বপ্নের নীরব পাথারে–

জীবনের নাম // খোশনূর

ধুলোর মত উড়ে যাওয়া স্বপ্ন
হতাশার কলুষ অন্ধকারে ঢাকা
দুর্বিষহ এই জীবনের নাম দুঃখ প্রতীক
বিষণ্ন মন্ময় দীর্ঘ তৃষ্ণা
নির্মম পীড়িত! দূষিত আমার জীবন
আমার জীবনের নাম আগুন
ঝুঁকে পড়া ভালবাসার সবুজ লতায়
যন্ত্রণার অবাধ্য বিষাক্ত সর্বনাশা কীট
দৃশ্যে-অদৃশ্যে সুখের বিদায়ী আর্তনাদ
ফিরে গেছে বসন্ত বিলাস
আনন্দের চির বিমুখতা
অসহায় অর্থহীন প্রতিটি মুহূর্ত
হৃদয় আক্রান্ত সন্ত্রাস স্বেচ্ছাচারে
এ জীবনের নাম নির্দ্বিধায় হতে পারে মরণ।

জ্যামিতি // সুজন হাজারী

পরিধি ভূগোলের কোন বিন্দু
মনে করি আহ্নিক গতি
ছুটেছে বি-র দিকে বি উপরে উঠে
সি-কে স্পর্শ করে ফিরছে এ-র কাছেই

এ বি সি-র মিলিত রেখায় ত্রিভুজ
অপরপ্রান্তের কোণে নিশ্চয়ই তুমি
এ বি সি-র মাঝখানে সে

আমি তুমি সে সমকোণী ত্রিভুজ
সমকোণ ব্যতীত দুকোণের সমষ্টি
এক সমকোণ অতএব
তুমি আর আমি এক সমকোণ।

কবি, মেনকা এবং একটি সন্ধ্যারাত

শাহীন রেজা

কবি দাঁড়িয়ে আছেন। অচঞ্চল প্রকৃতিকে আরও স্থবির করে তার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে মেনকা, স্বর্গের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এবং কবির ভালবাসা। কবি জানেন, এ চলে যাওয়া মানে শেষ যাওয়া নয়, তবুও তার হৃদয়ে পাড়ভাঙার গর্জন। কী এক গভীর আর্তনাদে মুহুর্মুহু কেঁপে উঠছে কবির আত্মা। বিপন্ন বিষাদ তার একাকীত্বের ধূসরে লেপে দিচ্ছে আরও এক পশলা নীল। কবি বিশ্বাস করেন, এই নীল মানেই পৃথিবী থেকে সব রঙ হারিয়ে যাওয়া। কবির চৈতন্য তাই বিলাপে মগ্ন। কবি এখন কি করবেন? প্রিয়জনের প্রস্থানে কি কি করতে পারেন তাঁর স্বজনেরা? কবি ভাবতে বসলেন।

কবির ভাবনায় শব্দ-সুর, জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ইহকাল-পরকাল এবং একান্তভাবে প্রেয়সীর চলে যাওয়া। কবি দাঁড়িয়ে আছেন, তার দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করছে মেঘ, নক্ষত্রপুঞ্জ, সন্ধ্যার মায়াবি চাঁদ আর সেই সাথে বাস, সিএনজি, রিকশা এবং চলমান মানুষেরা। কবি দাঁড়িয়ে আছেন, কবি তাকিয়ে আছেন। কবির অন্তরাত্মা জানান দিচ্ছে, মেনকার এ গমন শেষ গমন নয়। নিশ্চয়ই তিনি ফিরে আসবেন এই মর্ত্যলোকে। এবং ফিরে এসে কবিতার নিরেট ভূমিকে কর্ষণে কর্ষণে করে তুলবেন উর্বরা আর সেখানে বপন করবেন দ্রুত ফলনশীল সেইসব শব্দবীজ।

শান্তিনগর মোড়ে শুক্রবার সন্ধ্যারাতে মঞ্চস্থ হল এরকমই একটি পালা। সে পালার নায়ক সত্যিই একজন কবি আর মেনকা সে তো স্বর্গের উর্বশী; যিনি ভাব দিয়ে ভালবাসা দিয়ে কবির গন্ধম বৃক্ষে ফোটাবেন 'কবিতাকলি', ঠিক বিবি হাওয়ার মত।

বিজুরি

গোলাম কিবরিয়া পিনু

বিজুরিও আজ
পরিবাহী নয়
অদহনযোগ্য!
কালত্রয়দর্শী হয়ে শুধু অপেক্ষায়–
অন্ধকারে বাড়ে পাইরেসি
রাহাজানি আর জলদস্যুতা,
পড়ে থাকে জীবাত্মজ্বালানি
পাথুরে কয়লা!
সবাই কি বহ্নিহীন? নিবু নিবু?
ট্রান্সমিশন লাইনও আজ
বজ্রপাতে নষ্ট!
বিজুরি চঞ্চল হয়ে উঠছে না কেন?
নিজের ভেতর অগ্নিপ্রভা
নিজের ভেতর তাপমাত্রা
অশনিসংকেতে মেঘদীপ হয়ে যাবে?

কলকাতার ঘুঘু

ফখরে আলম

ফাঁদ দেখতে দেখতে আমি ঘুঘু দেখে ফেলেছি
তিলা দোলে সব বিদিক ঘুঘু
হরিয়াল দেখতে পাইনি
ওরা বলেছে, সবুজ এখানে নিরাপত্তাহীন।

সুচিত্রা সেনের বাড়ির পাশেই মোস্তফা কামাল
রেসকোর্সের তুখোড় বাজিকর
পাম প্যালেসের সরদার বাড়িতে থাকেন
চৌকিতে ঘুমান, একেবারে আকাশসমান
আম জাম বকুল হাওয়া তাকে এসির প্রশান্তি দেয়
ঘুঘু ডাকে ঘুমে আর প্রেমে।

কাঁটা তার বন্দুক ডিঙিয়ে ছুটে আসে গৃহপরিচারিকা
বুকের ভেতর থেকে বের করে ঘুঘুর নরম ছানা
মীর্জা গালিব স্ট্রিটে তখন পরিশ্রান্ত সবাই
ঘুঘু ডাকে কলকাতায়।

ঘুঘু ডাকে আমের পাতায়
ঘুঘু ডাকে মোস্তফায়
ঘুঘু ডাকে কবিতার খাতায়
ঘুঘু ডাকে দুই বাংলায়।

গোলাপের গাছে

রীনা তালুকদার

প্রত্যুষে কুয়াশায় ভরে আছে সবুজ মাঠ
ব্যায়ামের ভঙ্গিতে গাছেরা আছে নুয়ে
জড়াজড়ি ভালবাসাবাসি
গোলাপের বাগানে ফুটেছে সুগন্ধি গোলাপ
কখন কে কাকে দেবে তুলে সেই ভাবনায়
গোলাপ আর গাছে লেগেছে বিজয়ের পাঠ।

মহুয়া

অনীক মাহমুদ

লোকান্তিকা মহুয়া বলেছিল, যেতে পারি তবুও যাব না;
শক্তিরা বলেছে, কেন যাব?
মহুয়া পাথারে তারাও তো হেসেছিল,
কস্তুরী সৌরভে অরণ্যের স্বপ্নকলি বাতাসে উড়িয়ে
কেন যাব পারুলের বার্তা নিয়ে?
সাতভাই চম্পা জাগতে চেয়েও কুম্ভকর্ণে সমর্পিত,
হোমরা বেদেরা এখনো যায়, চুরি করে ব্রাহ্মণকন্যার কুষ্ঠি
তারাদের চুপি চুপি বলে, ঘুমুবে না;
জোনাকিদেরও বলে, পারলে সবাই মিলে চুরি করবে আলোটা–
যেতে পারি কিন্তু তবুও যাব না।

আমি দীপান্বিতা আমারও যাবার ইচ্ছাটা নেই।
নদের চাঁদের ভাতঘুম
দুষ্টু সদাগর, নষ্ট গাজন সন্ন্যাসী তারাও তো পরাজিত,
নাগিনীকন্যার বিষদাহ মহুয়া ফুলের রসে টের পায় মাতালেরা,
পদ্মভুক রাখালেরা বীণা বাজিয়েও পায় নাকো বোধিদ্রুম
ম্যানকা গাদ্দার ঢোকাধরা লোকটাও ভ্রমরের আল নিয়ে ঝাল ঝাড়ে
বেতের আড়ালে সতীনের দেওরারা পান্তার আমানি খুঁজে
সুর ভজে, 'বাড়ির কাছে বেতের আড়াল....
তোমার পালঙ সই চন্দ্র সূর্য সাক্ষী, গভীর নিশিন্দা ঘনবন
কাঙ্খের 'ঘাঘুরী'!
মইষের দইয়ের ননীছড়া গামছায় বেঁধে আর কাজ নেই;
স্বপ্নকল্পনার ভারা সোনার গাঁয়ের লোক জাদুঘরে
ক্রমশ বিইয়ে যায় ভারা ভারা আবেগী জাতক!
লোকান্তিকা মহুয়া সুন্দরী, করবাম– খাইবাম– যাইবাম
শব্দদের নাড়িভুড়ি ছিঁড়ে
স্মৃতিতে শ্রুতিতে আছ যারপর নাই লোককন্যার আদলে!
হে সময় গ্রন্থি, হে কান্তার কাঞ্চী মেঘমালা, নিবিড় আকাশ
কাকজ্যোৎস্না ঠেলে, কুহেলিকা চিরে এইখানে এই বনের কিনারে,
নদের চাঁদের কণ্ঠাশ্লেষে ঘুম আর ঘুমের পরাগে,
ব্যাকুল তিয়াশা নিয়ে এখনো জড়িয়ে আছ প্রিয়তি কুসুমে!
একটি প্রীতির কুরুবক ছুঁড়ে দিলে অভাগী আঁচলে
তোমরাও সহযাত্রী স্মার্ত মহাকুল গভীর স্বননে
বাঙলার কন্যা মহুয়ার মর্মধ্বনি শুনবে একাকী
ভালবাসা ভালবাসা প্রেমার্ত গুঞ্জনে...

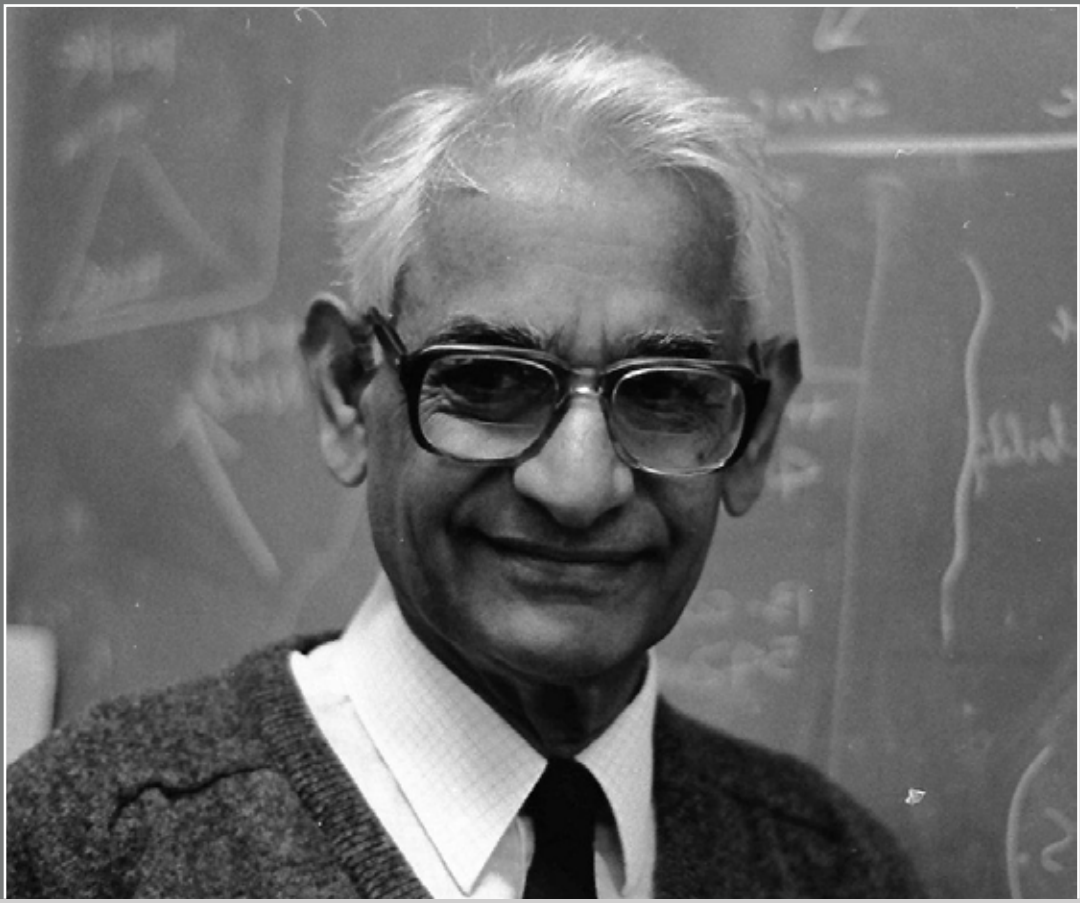

স্মরণ

ড. হরগোবিন্দ খোরানা

প থি কৃ ৎ বি জ্ঞা নী

উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় ১৯৬৮ সালে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন প্রাণরসায়ন বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা মার্শাল ডব্লিউ নিরেনবার্গ এবং রবার্ট ডব্লিউ হলির সঙ্গে ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল নিউক্লিক এসিডে নিউক্লিওটাইড্‌সের বিন্যাস– যা কোষের জেনেটিক কোড ধারণ করে এবং কোষের প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে। একই বছরে খোরানা ও নিরেনবার্গ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লুইসা গ্রস হরউইজট্ পুরস্কারও লাভ করেন।

ড. হরগোবিন্দ খোরানার জন্ম অধুনা পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের রায়পুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম শ্রী গণপত রায় খোরানা, মা শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবী। তাঁর প্রকৃত জন্মতারিখ জানা যায়নি, তবে সেটি ১৯২২ সালের ৯ জানুয়ারি হতে পারে বলে কিছু দলিল-দস্তাবেজ দেখে ধারণা করা হয়।

হরগোবিন্দ ছিলেন বাবা-মায়ের পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবার ছোট। বাবা ছিলেন একজন পাটোয়ারী– ব্রিটিশ ভারতের একজন কৃষি কর আদায়কারী। আত্মজীবনীতে খোরানা লিখেছেন, ‘গবীর হলেও আমার বাবা তাঁর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সিদ্ধান্ত নেন। একশো মানুষের বাসস্থান ছোট্ট গ্রামটিতে মাত্র আমাদের পরিবারটিই ছিল সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন।’

গ্রামের প্রথম চার বছরের শিক্ষাজীবন তাঁর কাটে গাছের ছায়ায় অনুশীলন নিয়ে। সেটাই ছিল গ্রামের একমাত্র বিদ্যালয়। পরে তিনি পশ্চিম পঞ্জাবের মুলতানের ডিএভি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এরপর বৃত্তি নিয়ে ভর্তি হন লাহোরের পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই তিঁনি ১৯৪৩ সালে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ও ১৯৪৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর হরগোবিন্দ ভারত সরকারের ফেলোশিপ নিয়ে ইংল্যান্ডে যান এবং লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়ন শিক্ষাক্রমে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালে জে এস বিয়ারের তত্ত্বাবধানে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। পরের বছর সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখের অধ্যাপক ভ্লাদিমির প্রিলগের অধীনে পোস্ট ডক্টরাল সমাপ্ত করেন। কাজটি তাঁকে বিনা পারিশ্রমিকে করতে হয়। প্রায় এক বছর অ্যালকালয়েড কেমিস্ট্রি নিয়ে কাজ করে ১৯৪৯ সালে দেশে ফিরে পাকিস্তানে কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে পুনরায় ইংল্যান্ড ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং সেখানে জর্জ ওয়ালেস কেনার ও আলেকজ্যান্ডার আর টডের অধীনে পেপটাইডস্ ও নিউক্লিওটাইড্স নিয়ে কাজ করেন। ১৯৫০ থেকে '৫২ সাল পর্যন্ত তিনি ক্যামব্রিজে অবস্থান করেন।

এ-সময় অর্থাৎ ১৯৫২ সালে তিনি ইস্টার এলিজাবেথ সিবলারকে বিয়ে করেন। সুইজারল্যান্ডে থাকতে তাঁদের পরিচয় প্রথম হয়। বলে রাখা ভাল, এই দম্পতির জুলিয়া এলিজাবেথ ও এমিলি এ্যান নামে দুই কন্যা এবং ডেভ রয় নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। যাহোক, বিয়ের পর ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রিটিশ কলাম্বিয়া রিসার্চ কাউন্সিলে কাজ করার সুযোগ পেয়ে সপরিবারে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় চলে যান। নতুন কর্মপরিবেশে নিজের একটি গবেষণাগার পেয়ে তিনি রীতিমত উত্তেজিত, উচ্ছ্বসিত। রিসার্চ কাউন্সিলের পরামর্শক পরে বলেন, 'সে-সময়ে গবেষকদের আমরা সুযোগ-সুবিধা খুব একটা দিতে পারতাম না সত্যি, কিন্তু তাঁদের স্বাধীনতা ছিল অবাধ, বিশ্বজোড়া।' আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি জানায়, ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় তাঁর কাজ ছিল 'নিউক্লিক এসিড এবং গুরুত্বপূর্ণ বায়োমলিকিউলসমূহের সংশ্লেষণ'। ১৯৬০ সালে ড. খোরানা মেডিসনের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এনজাইম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহ-পরিচালক পদে বৃত্ত হন। ১৯৬২ সালে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের জীবনবিজ্ঞানের 'কনরাড এ এলভেজেম অধ্যাপক' নিযুক্ত হন।

উইসকনসিনে থাকার সময় তিনি প্রোটিন সংশ্লেষণে আরএনএ কোড আবিষ্কারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি বলছে, এ-সময় তিনি কর্মরত জিনের সংশ্লেষণবিষয়ক কাজ শুরু করেন। এখানে অবস্থানকালে এই মৌলিক গবেষণার সুবাদে তিনি যৌথভাবে নোবেল পুরস্কারের দুর্লভ সম্মান লাভ করেন। নোবেল ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে লেখা হয়েছে: 'এটা ছিল তাঁদের জেনেটিক কোডের ব্যাখা এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে তাঁর কাজের স্বীকৃতি।' হরগোবিন্দ খোরানার ভূমিকা বিষয়ে লেখা হয়েছে: 'তিনি এনজাইমের সাহায্যে স্বতন্ত্র আরএনএ শিকল তৈরি করে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এসব এনজাইম ব্যবহার করে তিনি প্রোটিন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব প্রোটিনের অ্যামাইনো এসিড ক্রম (sequence) তারপর বাকি ধাঁধার সমাধান করে।'

১৯৬৬ সালে তিনি মার্কিন নাগরিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে হরগোবিন্দ ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে 'আলফ্রেড পি স্লোয়ান জীববিজ্ঞান ও রসায়ন অধ্যাপক' পদে বৃত হন এবং পরে স্ক্রাইপস্ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সায়েন্টিফিক গভর্নর বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন। এমআইটি থেকে তিনি ২০০৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

গবেষণা

৩টি পৌনঃপুনিক ইউনিট (UCUCUCU→UCU CUC UCU)- সহ রাইবোনিউক্লিক এসিড (RNA) ২টি পৌনঃপুনিক অ্যামাইনো এসিড তৈরি করে। এটি নিরেমবার্গ ও লেডার পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেরিনের জন্য CUC জেনেটিক কোড এবং লিউসিনের জন্য UCA কোড প্রদর্শন করে। ৩টি পৌনঃপুনিক ইউনিট (UACUACUA→UAC UAC UAC, অথবা ACU ACU ACUA বা CUA CUA CUA)-সহ RNA ৩টি আলাদা অ্যামাইনো এসিডের রজ্জু তৈরি করে। ৪টি পৌনঃপুনিক ইউনিট UAG UAA বা UGA-সহ RNA শুধুমাত্র ডাইপেপ্টাইড্স ও ট্রাইপেপ্টাইডস্ তৈরি করে। এভাবে প্রকাশিত হয় যে, UAG UAA ও UGA হচ্ছে 'বন্ধ কোডোন'।

১৯৬৮ সালের ১২ ডিসেম্বর নোবেল বক্তৃতা প্রদান করা হয়। ড. খোরানা ওলিগোনিউক্লিওটাইড্স রাসায়নিকভাবে সংশ্লেষণকারী প্রথম বিজ্ঞানী। এই অর্জন ১৯৭০-এর দশকে ছিল পৃথিবীর প্রথম সিনথেটিক জিন। পরবর্তীকালে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। CRISPR/Cas9 পদ্ধতি দিয়ে জেনোম এডিট করতে গিয়ে পরবর্তী গবেষকরা তাঁর গবেষণার উল্লেখ করেন।

পরবর্তী গবেষণা

তিনি অ-জলীয় রসায়ন ব্যবহার করে লম্বা DNA পলিমার তৈরি এবং DNA-খণ্ডগুলি একত্রিত করে শিকল প্রস্তুতকারী পলিমারেজ ও লিগেজ এনজাইম ব্যবহার করে প্রথম সিনথেটিক জিন বিন্যস্ত করেন যে পদ্ধতি পলিমারেজ চেইন রি-অ্যাকশন (PCR) উদ্ভাবনের দুয়ার খুলে দেয়। এসব প্রথাগত নকশাকৃত কৃত্রিম জিনখণ্ড ক্রম, ক্লোনিং, নতুন প্রাণি ও উদ্ভিদ প্রকৌশলের জন্য জীববিজ্ঞান গবেষণাগারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। শুধু তাই নয় জিনগত রোগ ও জিনের বিবর্তন বুঝতে DNA-র অধিকতর ব্যবহারে এ কৃত্রিম জিনখণ্ড অপরিহার্য।

খোরানার আবিষ্কারগুলো এখন স্বয়ংক্রিয় ও বাণিজ্যিক হয়ে গেছে যাতে যে-কেউ একাধিক কোম্পানির কাছ থেকে একটি সিনথেটিক ওলিগোনিউক্লিওটাইড্ বা একটি জিন কিনতে পারেন। যে-কেউ যে-কোন কোম্পানির কাছে জেনেটিভ ক্রম পাঠিয়ে ঈপ্সিত ক্রমর একটি ওলিগোনিউক্লিওটাইড্ পেতে পারেন।

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর বিশ্বখ্যাত গবেষণাগার ব্যাকটেরিওরোহ্ডোসপিনের প্রাণরসায়ন সমীক্ষা করে। এটি হচ্ছে একটি মেমব্রেন প্রোটিন যা একটি প্রোটিন উপাদান তৈরি করে আলোকশক্তিতে রাসায়নিকশক্তিতে রূপান্তরিত করে। পরে তাঁর গবেষণাগার রোহ্ডোসপিন নামে কাঠামোগতভাবে সম্পর্কযুক্ত দৃশ্যমান পিগমেন্টের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে।

উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহকর্মীরা তাঁর কাজের মূল্যায়ন করে বলেন, 'খোরানা ছিলেন প্রথমদিককার একজন অনুশীলনকারী এবং সম্ভবত কেমিক্যাল জীববিজ্ঞানের জনক। তিনি বিভিন্ন ট্রাইনিউক্লিওটাইড্সের সংমিশ্রণের ওপর নির্ভর করে জেনেটিক কোড ভাঙতে রাসায়নিক সংশ্লেষণের শক্তি সম্পর্কে আমাদের অবগত করেন।'

পুরস্কার ও সম্মান

যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার ছাড়াও ড. খোরানা ১৯৭৮ সালে রয়্যাল সোসাইটির বিদেশী সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৭ সালে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত সরকার এবং ভারত-মার্কিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফোরাম একটি খোরানা প্রোগ্রাম প্রবর্তন করে যেখানে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী, শিল্পপতি ও সামাজিক উদ্যোক্তারা একযোগে কাজ করতে পারেন। এ ছাড়াও, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লুইসা গ্রস হরউইজ পুরস্কার, এবং মৌলিক চিকিৎসা গবেষণার জন্য লস্কর ফাউন্ডেশন পুরস্কার, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির শিকাগো সেকশনের উইলার্ড গিবস্ মেডেল, গার্ডনার ফাউন্ডেশনের বার্ষিক পুরস্কার, রেটিনা গবেষণার জন্য পল কেসার আন্তর্জাতিক মেরিট পুরস্কারসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এই কৃতী বিজ্ঞানী।

২০১১ সালের ৯ নভেম্বর ৮৯ বছর বয়সে ম্যাসাচুসেটস্-এর কনকর্ডে এই বিজ্ঞানী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্ত্রী এস্টার ও কন্যা এমিলি এ্যান্ আগেই মারা গিয়েছিলেন। তার অন্য কন্যা জুলিয়া ও পুত্র ডেভ রয় বেঁচে আছেন। জুলিয়া তাঁর বাবা সম্পর্কে লিখেছেন, 'এসব গবেষণা ছাড়াও তিনি শিক্ষা, শিক্ষার্থী এবং তরুণদের সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন।

২০১৮ সালের ৯ জানুয়ারি তাঁর ৯৬তম জন্মদিনে গুগল ডুডল তাঁর বৈজ্ঞানিক অর্জনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

সূত্র **ইন্টারনেট** • অনুবাদ **মানসী চৌধুরী**

ভ্রমণ

মেঘ অরণ্য ও জলপ্রপাতের দেশে

বিপ্লব দে

সবুজ প্রকৃতি। দিগন্তজুড়ে রঙের ছোঁয়া। দ্রষ্টব্য নয়নাভিরাম। দিগন্তছোঁয়া পাহাড়। আকাশ ও মেঘের অবিরাম লুকোচুরি। প্রতিনিয়ত আভা ছড়ায় সৌন্দর্য। আলোয় ভরা বিস্তৃত আঙিনা। সুন্দর পরিপাটি সুশৃঙ্খল একটি রাজ্য। বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ ভাষার মানুষদের সমষ্টি। যেখানে রয়েছে অরণ্য, জলপ্রপাতের ছড়াছড়ি। এই বৃষ্টি তো এই রোদ। তবে সে রোদের তীব্রতা নেই, আছে মিষ্টতা। আবহাওয়া এত মনোরম যে প্রথম দেখায় প্রেমে পড়বেন যে-কেউ।

বলছি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মেঘালয় রাজ্যের কথা। মেঘালয় উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে অসম রাজ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাংলাদেশ অবস্থিত। মেঘালয়ের রাজধানী শিলং। কেউ কেউ বলেন, দার্জিলিং রূপের রানি হলে শিলং রূপের রাজা।

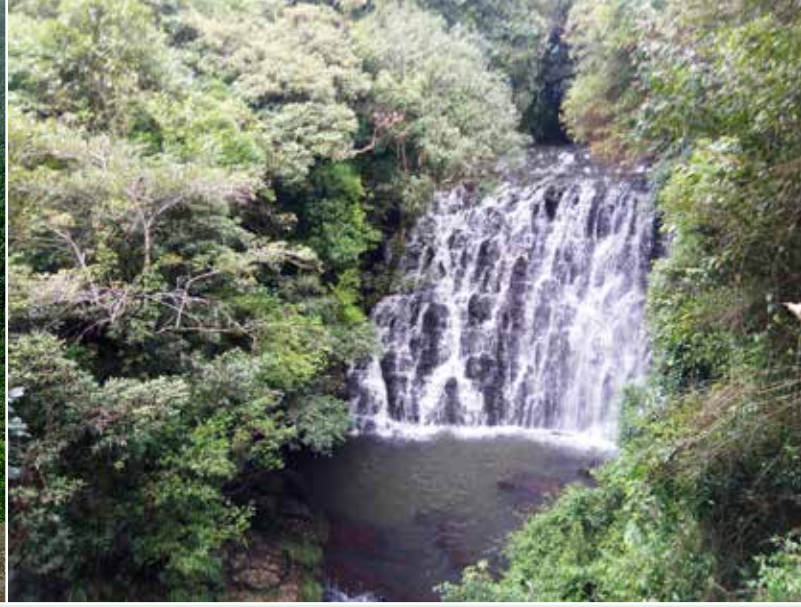

ভূগোলের বইয়ে পড়েছিলাম পৃথিবীতে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় উত্তর-ভারতের মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জিতে, যেখানে রয়েছে মেঘের সঙ্গে খেলা করার সুযোগ। তাই অনেকদিন ধরে পরিকল্পনা ছিল মেঘালয় ঘুরতে যাবার। অবশেষে পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপ নিল বন্ধু সাইফুদ্দিন সালাম মিঠু, আখতার হোসেন ও তরুণ ব্যবসায়ী শফিকুর রহমান মিলে চারজনের একটি দল গঠনের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় ভিসা নিয়ে প্রহর গুণতে থাকলাম মেঘালয় যাবার। তারপর সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে রাতের বাসে রওনা দিয়ে সকালে পৌঁছলাম সিলেটে।

সিলেটে কিছুক্ষণ কাটিয়ে রওনা দিলাম তামাবিলের উদ্দেশ্যে। ট্যাক্সি যোগে দেড়ঘণ্টায় পৌঁছলাম তামাবিল ইমিগ্রেশন অফিসে। বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন অফিসের কাজকর্ম শেষে হেঁটে অতিক্রম করলাম ডাউকি সীমান্ত। সেখানে ভারতীয় সীমান্তরক্ষাকারী বাহিনি আমাদের কাগজপত্র দেখলেন। পাঠালেন ইমিগ্রেশন অফিসে। সেখানে আধাঘণ্টা সময় লাগে ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করতে।

ইমিগ্রেশন অফিস থেকে বেরিয়ে পাওয়া গেল শিলং যাওয়ার ভাড়ায় চালিত ট্যাক্সি ক্যাব। গাড়ি ঠিক করে রওনা দিলাম মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ের উদ্দেশ্যে। ডাউকি থেকে শিলংয়ের দূরত্ব প্রায় ৮৩ কিলোমিটার। সীমান্ত পার হয়ে শুরু হয় আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ। পাহাড়চূড়ার আঁকাবাঁকা পথে চলতে চলতে মনে হবে এই দূরত্ব আরও বেশি হলেই বোধহয় ভাল ছিল। চলার পথে আপনাকে সঙ্গ দেবে চারপাশের অসাধারণ সুন্দর সব পাহাড়। কখনও চারপাশ থেকে ঢেকে দেবে মেঘমালা। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় মেঘকে। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে মনে হবে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়া এক যাযাবর। কখনও-বা পাহাড়ের ঢালে সরু রাস্তার আরেক পাশেই গভীর খাদ। এ এক 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' দৃশ্য।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা ট্যাক্সি ক্যাবে চড়ে সাড়ে বারোটার দিকে পৌঁছলাম শিলং শহরের পুলিশ বাজারে। পুলিশ বাজারে নেমে চার বাংলাদেশী মিলে কিছু খাবার খেলাম। পুলিশ বাজারে খাবারের দোকানের অভাব নেই। পুলিশ বাজারে অনেকগুলো হোটেল দেখলাম। কিন্তু শিলংয়ে এত বেশি পর্যটক ছিল যে আমরা কোন হোটেল খালি পেলাম না। আর বাংলাদেশী বললেই তারা বারবার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। সর্বশেষ এক ট্যাক্সি চালকের সহযোগিতায় শিলং শহরের লাবান বিষ্ণুপুর এলাকায় একটি হোটেল পেলাম। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়ালাম পুলিশ বাজার, লাবান ও আশেপাশের শহর।

পরদিন বেড়িয়ে পড়লাম চেরাপুঞ্জির উদ্দেশ্যে। চেরাপুঞ্জি বা সোহরা হচ্ছে শিলংয়ের মূল আকর্ষণ। সেভেন সিস্টারস ফলস, মাউসামি কেভ, নুকায়কালী ফলস, মাউন্টেইন ভিউ। ভারতের স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ পরিবারদের জন্য এটি ছিল একটি জনপ্রিয় পাহাড়ি রিজর্ট। এখানে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয়। তাই ঘুরতে আসলে রেইন কোর্ট বা ছাতা রাখা জরুরি। সারাদিন চেরাপুঞ্জিতে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগেই ফিরলাম আবার শিলং শহরে। শহরে ফিরে আবার সেই পুলিশ বাজারে খাবার খেতে গেলাম। শিলংয়ের মানুষ খুবই ভোজনরসিক। সন্ধ্যার পর রাস্তার দু'ধারে খাবারের দোকান বসে। বিভিন্ন বয়সী মানুষ দাঁড়িয়ে বা বসে খেতে থাকে বিভিন্ন স্পাইসি খাবার। রাতের শিলং খুবই চমৎকার। বাড়িগুলোতে যখন বাতি জ্বলে, মনে হবে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে তারার মেলা।

শিলং শহরের আশেপাশেও রয়েছে অনেক দর্শনীয় স্থান। সেগুলো হচ্ছে উমিয়াম লেক, ডন বাসকো মিউজিয়াম, ওয়ার্ড লেক, এলিফ্যান্ট ফলস্, শিলং পার্ক ভিউ। শিলং পার্ক ভিউ শিলং শহর থেকে প্রায় চার হাজার ফুট উপরে। এখান থেকে আপনি পুরো শিলং শহরটি দেখতে পারবেন। পার্ক ভিউটি সে-দেশের বিমানবাহিনির নিয়ন্ত্রণে। তাই সেখানে সতর্কতার সঙ্গে ঢুকতে হবে। শিলং ভ্রমণে দেখা হয়েছিল সাবেক যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে। বাংলাদেশী তথা চট্টগ্রামের জানার পর তিনি আমাদের খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন এবং নিজের রেস্ট হাউসে ডেকে নিয়ে আপ্যায়নও করেছিলেন।

মেঘালয় হচ্ছে মেঘেদের বাড়ি; কবিদের অনুপ্রেরণা ও চিত্রকরদের ক্যানভাস– বেড়ানোর জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় জায়গা। এটি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি রাজ্য হিসাবে ঘোষিত হয়। মেঘালয় ছবির মত সুন্দর একটি রাজ্য। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ মেঘের সমাবেশে জীবনের কিছু রঙিন মুহূর্ত কাটানোর উপযুক্ত জায়গা। মেঘালয় সেভেন সিস্টার খ্যাত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম সুন্দর একটি রাজ্য। মেঘালয়কে পাঁচটি প্রশাসনিক জেলায় ভাগ করা হয়েছে– জৈন্তা পাহাড়, পূর্ব এবং পশ্চিম গারো পাহাড়, পূর্ব এবং পশ্চিম খাসি পাহাড়।

এ অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির বাস, তাই উৎসবেরও আধিক্য। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা মহা সমারোহে পালন করেন বড়দিন, গুড ফ্রাইডে, ইস্টার, ইত্যাদি পরব। ইংরেজি নববর্ষেও আনন্দমুখর হয়ে ওঠেন পাহাড়িরা। খাসি উপজাতিরা পালন করেন শাদ সুকমিনসিয়েম পরব। কা পমব্যাং নংক্রেম অথবা নংক্রেম নৃত্যও অতি প্রসিদ্ধ খাসি উৎসব। জৈন্তা উপজাতীয়দের পার্বণ বেহদিয়েংখ্লাম পালিত হয় প্রতি বছর জুলাই মাসে। গারোরা পালন করেন ওয়াংগালা উৎসব যা আদতে সূর্যের উপাসনা। সব মিলিয়ে মেঘালয় ভ্রমণপিপাসুদের জন্য উপযুক্ত জায়গা।

কিভাবে যাবেন

ঢাকা থেকে বিআরটিসি শ্যামলীর গাড়ি ছাড়ে প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে এবং ফিরে আসে সোমবার রাত ১০টায়। শিলং যাবার এটাই সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। আর বন্দর নগরী চট্টগ্রাম থেকে যেতে হলে গরীবউল্লাহ শাহ মাজার প্রাঙ্গণ থেকে সিলেটের বাসে করে সিলেট যেতে হবে। সেখান থেকে তামাবিল ইমিগ্রেশন অফিস। হেঁটে বর্ডার অতিক্রম করে সেখানেই পাওয়া যায় শিলং শহরে যাওয়ার ট্যাক্সি বা কার। মনে রাখবেন ট্রাভেল ট্যাক্স ৫০০ টাকা দিতে হবে, সেটা রওনা দেয়ার আগে সোনালী ব্যাংক থেকে দিয়ে যাওয়াই ভাল।

ভিসা

ভারতের ভিসার সব ডকুমেন্টই (ন্যাশনাল আইডি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট/ডলার এনডোর্স/ক্রেডিট কার্ডের ফটোকপি, লেটার অফ ইন্ট্রোডাকশন, ইত্যাদি) লাগবে। আর পোর্ট অফ এন্ট্রি এক্সিট ডাউকি সিলেক্ট করুন।

কখন যাবেন

মেঘালয় সারা বছরই যেতে পারেন। কারণ মেঘালয়ের আবহাওয়া এত মধুর যে আপনি যে-কোন সময় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন। তবে পূজার সময়টা এড়িয়ে যেতে পারেন। তখন খুব বেশি ভিড় থাকে। আর বর্ষার সময় যাবার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি যেমন রেইন কোট, ছাতা সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কারণ চেরাপুঞ্জিতে অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এছাড়াও ছোটবাচ্চা থাকলে ডিসেম্বর-জানুয়ারি সময়টা এড়িয়ে যেতে পারেন। কারণ তখন তাপমাত্রা ৩ থেকে ১০ ডিগ্রি থাকে, তবে বরফ পড়ে না।

কোথায় থাকবেন

মেঘালয়ের পুলিশ বাজারের আশেপাশে অনেকগুলো হোটেল আছে। ভাড়া ২০০০-৫০০০ রুপি। খোঁজাখুজি করে উঠে পড়ুন। এছাড়া বিষ্ণুপুর, লাবান এলাকায়ও কম দামে হোটেল পাবেন। চারজন একসঙ্গে বেড়াতে গেলে ভাল। কারণ এখানকার হোটেলগুলোতে দুই বেডে চারজন থাকার ব্যবস্থা আছে।

কোথায় খাবেন

পুলিশ বাজারের আশেপাশে অনেকগুলো খাবার হোটেল আছে। সেখানে ভাত-মাছ খেতে পারেন। জনপ্রতি ১০০-১৫০ রুপি খরচ হবে। এছাড়া *সাবওয়েসহ* আরো কয়েকটি চেইন আছে যেগুলোতে ২০০-৩০০ রুপিতে খেতে পাবেন।

শিলং থেকে অন্যান্য শহর

হাতে সময় থাকলে আসামের রাজধানী গুয়াহাটিসহ অন্যান্য শহরও ঘুরে আসতে পারেন। শপিংয়ের ইচ্ছা থাকলে গুয়াহাটি ঘুরে আসতে পারেন, যেতে সময় লাগবে ৩ ঘণ্টা। এছাড়া অরুণাচল রাজ্য ও অন্য যে-কোন প্রদেশও ঘুরে আসতে পারেন।

টিপস

১. শিলংয়ে ডলার ভাঙানো খুব সমস্যা। ব্যাংকিং আওয়ারের মধ্যে আসতে পারলে ব্যাংক থেকে ভাঙান আর না পারলে পুলিশ বাজারে কিছু কাপড়ের দোকানে ডলার ভাঙাতে পারেন।

২. মেঘালয়ে স্থানীয় যেমন গারো/খাসিয়া/নেপালী ট্যাক্সি ড্রাইভার নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

৩. সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মোটামুটি লোক চলাচল কমে যায়। তবুও মুভি দেখতে যেতে পারেন।

৪. রবিবার মোটামুটি সবকিছুই বন্ধ থাকে, কথাটা মাথায় রাখবেন।

বিপ্লব দে
স্টাফ রিপোর্টার, বাংলা টিভি, চট্টগ্রাম ব্যুরো অফিস
আইনজীবী

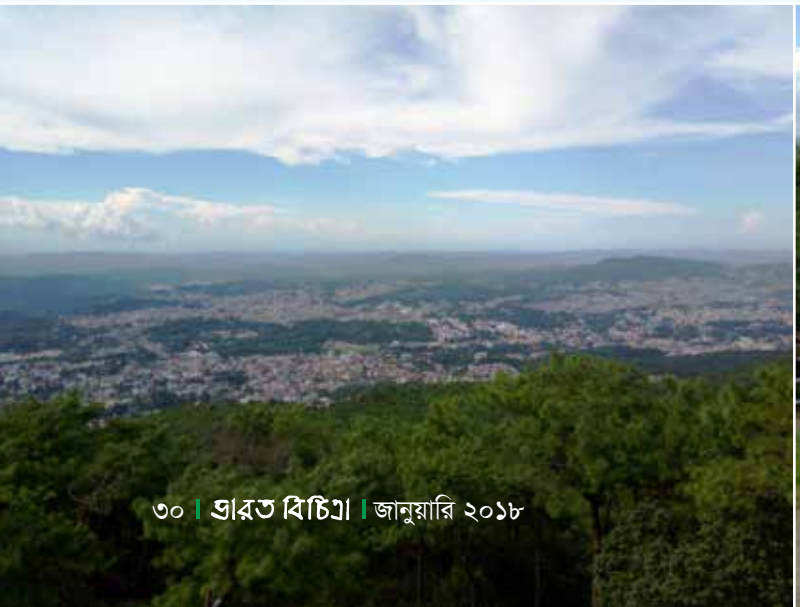

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারত ও বাংলাদেশে পড়ালেখার জন্য বিভিন্ন স্কিমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিপুলসংখ্যক স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। এগুলি নিম্নরূপ:

১. আইসিসিআর স্কলারশিপসমূহ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স (আইসিসিআর) ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কোর্স গ্রহণে নিম্নোক্ত স্কলারশিপসমূহ প্রদান করে:

ক. ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম;
খ. বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম;
গ. সার্ক স্কলারশিপ স্কিম;
ঘ. কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম; এবং
ঙ. আয়ুশ স্কলারশিপ স্কিম।

ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম

যুব বিশেষত বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থী বিনিময় বৃদ্ধির ভারতীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরকালে মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম ঘোষণা করেন। সেই সূত্রে আইসিসিআর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে স্কিমটি প্রবর্তন করে। এ বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/পিএইচ ডি কোর্স (ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিসিন ছাড়া)-এ ভারতে অধ্যয়ন করতে পারেন।

বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর প্রতি বছর প্রকৌশল, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, ফার্মাসি, চারুকলা ও চিরায়ত ভারতীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়নে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

সার্ক স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/স্নাতকোত্তর/ এম ফিল/ পিএইচডি (মেডিসিন ছাড়া) কোর্সে স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

উপরোক্ত ক-ঘ স্কিমগুলির জন্য সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দানের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আরো তথ্যের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন: www.hcidhaka.gov.in

আয়ুশ স্কলারশিপ স্কিম

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আইসিসিআর-এর এ কোর্সের জন্য স্কলারশিপ নির্বাচন সমন্বয় করে থাকে। স্কিমটি সাধারণত জুলাই মাসে ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় শিক্ষাবৃত্তি ২০১৭-১৮

আবেদনকারীদের বিপুল সাড়া এবং আগ্রহের প্রেক্ষিতে ভারতীয় হাই কমিশন আইসিসিআর শিক্ষা বৃত্তি ২০১৭-২০১৮-এর আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

শিক্ষাবৃত্তির জন্য বিস্তারিত তথ্য/দিক নির্দেশনাসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার এই লিঙ্ক http://www.hcidhaka.gov.in/pages.php?id=19741-এ দেওয়া হয়েছিল। প্রার্থীকে এই লিঙ্ক থেকে আবেদন পত্র ডাউনলোড এবং পূরণ (টাইপ করা হতে হবে, হাতে লেখা গ্রহণযোগ্য নয়) করতে বলা হয়েছিল। আবেদনপত্রে ছবি স্ক্যান করে সংযুক্ত করে এবং স্বাক্ষর (হাতে লিখে স্ক্যানকৃত স্বাক্ষর) ও তথ্যাদিসহ আবেদনপত্রটি পিডিএফ ফরম্যাটে তৈরি করে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ নিচে উল্লেখিত যে কোন ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপের জন্য এবং পরবর্তীতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষার করার জন্য ই-মেইল করতে বলা হয়:

ক. ভারতীয় হাই কমিশন,ঢাকা: attedu@hcidhaka.gov.in
খ. সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, চট্টগ্রাম: ahc@colbd.net
গ. সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, রাজশাহী: ahc.rajshahi@mea.gov.in

যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষা (ইপিটি) অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জানুয়ারি ২০১৭। এবছর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে রেকর্ডসংখ্যক ১৭২১ জন শিক্ষার্থী ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স-এর আইসিসিআর স্কলারশিপ ২০১৭-র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি, আবেদনের শেষ সময়, যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা ইত্যাদি ফেসবুকের এই পেজসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

• বিজ্ঞপ্তি

মুক্তিযুদ্ধ // ২

ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় উৎসব

ড. আবুল আজাদ

মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের ৪৬ বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে ২০১৭ সালে। একাত্তরের এই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান অংশীদার আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত। যুদ্ধটা বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে হলেও পাকিস্তান এক পর্যায়ে ভারতের পশ্চিম ফ্রন্টে বিমান হামলা করলে ভারত-বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। এক পক্ষে বাংলাদেশ-ভারত। প্রতিপক্ষে পাকিস্তান। এই সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরুর মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তান জেনেভা কনভেনশনের শর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনির ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ এবং মিত্রবাহিনির প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সেই ঐতিহাসিক বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে ভারতীয় সেনাবাহিনির ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দফতর ফোর্ট উইলিয়ামে প্রতিবছর আয়োজন করা হয় বিজয় উৎসবের। উৎসবে বাংলাদেশ থেকে একটি মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি দল প্রতি বছর সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন। গত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশও একই সময়ে অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে।

এ বছর ৩০ নভেম্বর ভারত সরকারের পক্ষে ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের সামরিক উপদেষ্টা বিগ্রেডিয়ার জে এস নন্দা বাংলাদেশের ৩০ সদস্যের একটি মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধিদল এবং সামরিক বাহিনির ৬ জন কর্মকর্তাকে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ভারত সরকারের আমন্ত্রণ পাঠান।

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেক্টরের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাবসেক্টর কমান্ডার বর্তমান গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি। জাতীয় সংসদের সাবেক চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ, সাবেক এমএনএ ও এমপি এবং সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য এডভোকেট এনায়েত আলী, গাজী গোলাম দস্তগীর এমপি, লে. জেনারেল (অব.) মোল্লাহ ফজলি আকবর পিএইচডি, ওয়াশিকা আয়শা খান এমপি, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ডা. প্রাণগোপাল দত্ত, মুক্তিযুদ্ধ একাডেমি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড. আবুল আজাদ, প্রফেসর মো. শাহেদ হাসান, যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুন্যালের প্রসিকিউটর-অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল মো. সুলতান মাহমুদ, লে. ক. মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন আহমেদ বীর উত্তম, ব্রিগেডিয়ার শহীদুল্লাহ চৌধুরী এনডিসি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সেন্ট্রাল কমান্ড কাউন্সিলের অরগানাইজিং সেক্রেটারি আবুল বাশার মোহাম্মদ সুলতান আহমেদ।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ক্লাব লি.-এর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন ফোরকান, বীর মুক্তিযোদ্ধা জেমস লিও ফার্গুসন, বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির সেক্রেটারি আবদুল মোতালেব পাঠান, বাংলাদেশ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন খান রাজিবসহ ৩৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল এবং তাদের পরিবার-পরিজনসহ মোট ৭২-সদস্যের দলটি নিয়ে দলনেতা মাননীয় গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ১৪ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় রিজেন্ট এয়ারলাইনসের একটি বিশেষ বিমানে করে ঢাকার হয়রত শাহজালাল বিমান বন্দর থেকে কলকাতার দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছান। ভারতীয় সেনাবাহিনির ইস্টার্ন কমান্ডের একটি চৌকস সেনা প্রতিনিধিদল সামরিক নিরাপত্তায় অতিথিদের কলকাতার তাজ বেঙ্গলে নিয়ে যান। ১৪ থেকে ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল কড়া সামরিক নিরাপত্তার মধ্যে এই হোটেলেই অবস্থান করেন।

চার দিনের এই সফরসূচি ছিল হৃদয়স্পর্শী নানা কর্মসূচিতে ঠাসা। যৌথভাবে বিজয়ের মহিমাকীর্তন ও তাৎপর্য উদযাপনের একাগ্রতা আর ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধুত্বের প্রকাশে নানা আয়োজনে সামরিক-বেসামরিক ব্যবধানটি আর থাকে না আত্মত্যাগ আর রক্তক্ষরণের স্মৃতি, স্বজন হারানোর বেদনা এবং দীর্ঘ ৪৬ বছর পর একত্রিত হবার এই আনুষ্ঠানিক উৎসবটি বন্ধুত্বের মহানুভবতায় চূড়ান্ত প্রতীকে নিরীক্ষিত হয়।

মহান বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর সকালে ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় স্মারকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের প্রধান গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি এবং ভারতীয় সেনাবাহিনির ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার ইন চিফ লে. জেনারেল অভিকৃষ্ণসহ উভয় দেশের তিন সামরিক বাহিনির কর্মকর্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর উভয় দেশের বীরযোদ্ধা-মুক্তিযোদ্ধাদের মিলনমেলা, গণমাধ্যমের সঙ্গে আলোচনা, ফটোসেশন এবং ফোর্ট উইলিয়ামের সেনাপতি ভবনের গার্ডেনে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজনগুলো ছিল প্রাণবন্ত, হৃদয়স্পর্শী এবং স্মরণীয় অধ্যায়। আমার পাশে বসে থাকা খুলনার সাবেক এমএনএ ও এমপি এবং সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য বর্ষীয়ান এডভোকেট এনায়েত আলী বলছিলেন, এখানে না এলে জীবনের অনেক কিছুই অজানা এবং অদেখা থেকে যেত। এতে আমিও উদ্বুদ্ধ হই এবং বার্তাটা আয়োজকদের পৌঁছে দিতে সেনাপতি লে. জেনারেল অভিকৃষ্ণকে অনুরোধ করি। তিনি বলেন, তুমি নিজেই বলো না। বক্তা কিন্তু নির্ধারিত ছিল ৫ জন। এরা সবাই সর্বজনস্বীকৃত বীর। সবাই স্মৃতিচারণ করছিলেন মুক্তিযুদ্ধের, প্রশংসা করছিলেন গ্রেট হিরোদের, কামনা করছিলেন উভয় দেশের বন্ধুত্বের দীর্ঘ জীবন। আমিও বিনয়ের সঙ্গে বললাম, পথভ্রষ্ট জাতিই ইতিহাস ভুলে যায়। আমরা উভয় দেশ তার মধ্যে পড়ি না। তাই ৪৬ বছর পর আমরা একত্রিত হয়েছি। কিন্তু সব আলো রং যেমন একদিন যৌলুশ হারায় তেমনি যৌবনদীপ্ত যোদ্ধাটিও একদিন বৃদ্ধ হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু হয়। বিজয় অর্জনের পর শুরু হয় আরেক যুদ্ধ। সেটি হচ্ছে দেশ গড়ার যুদ্ধ। বন্ধুত্ব গাঢ় করার তাগিদ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লড়াই। এই লড়াইয়ে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী-প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি একাত্তরের পর থেকেই দেশ বিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর দীর্ঘ ২১ বছর সামরিক বাহিনির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশ শাসন করে। দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং মুক্তিযোদ্ধা পরিবারগুলোর ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। যার প্রভাব পড়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ওপর। বর্তমানে বাংলাদেশের শেখ হাসিনার সরকার এই অবস্থাকে অনেকটা পূর্বস্থানে ফিরিয়ে আনলেও বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ রয়েই গেছে। পাকিস্তান আমলের শত্রু সম্পত্তি আইনে চিহ্নিত সম্পত্তিসমূহ এবং বর্তমানে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভূসম্পত্তির অধিকাংশই দখল করে আছেন রাজনীতিবিদ, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এবং সুবিধাবাদী প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন এবং উভয়দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন রচনার কোন বিকল্প নেই। ভারত সরকার বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী। এসব উন্নয়নের সঙ্গে সাংস্কৃতিক খাতে উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করলেই দ্রুত পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং সম্পর্কোন্নয়ন সম্ভব।

অনুষ্ঠানে পরিচয় হয় মিত্রবাহিনির বিগ্রেডিয়ার বি কে পানওয়ার (ছত্তিশগড় পুলিশের আইজিপি), ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস ব্রার (৭ রাজপুত রাইফেলস), কর্নেল এস চৌধুরী, মেজর (অব.) আর কে ভট্টাচার্য, মেজর (অব.) উদয়ের সঙ্গে। মেজর উদয় একাত্তরে মিত্রবাহিনির একটি কমান্ড নিয়ে কুমিল্লার ইলিয়াটগঞ্জ, চান্দিনা, দেবিদ্বার অঞ্চলে যুদ্ধ করে কুমিল্লা সেনানিবাসে আশ্রয়গ্রহণকারী পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। উচ্ছ্বসিত আবেগ নিয়ে সেই ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন উদয়। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ব্রার ভৈরব ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মিত্রবাহিনির এইসব বীর সৈনিকরা এখনো সহযোদ্ধা এবং মুক্তিবাহিনির শহীদদের স্মৃতি বুকে ধারণ করে বিজয়ের গৌরবে উচ্ছ্বসিত।

চারদিনের এই বিজয় উৎসবের সূচনা ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ামের প্রিন্সগেটে মিলিটারি ব্যান্ড কনসার্ট দিয়ে। ত্রিপুরার গভর্নর লে. জেনারেল তথাগত রায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে উভয় দেশের বীরযোদ্ধাদের স্বাগত জানান। ১৫ ডিসেম্বর পূর্বাহ্নে ফোর্ট উইলিয়ামের অডিটোরিয়ামে উভয় দেশের বীর যোদ্ধাদের মধ্যে পরিচয় ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে ফোর্ট উইলিয়াম মাঠে হর্স এবং হেলিকপ্টার শো অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম বাংলার গর্ভনর লে. জেনারেল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। রাতে ফোর্ট উইলিয়াম স্টেডিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। ভারতের ১২টি প্রদেশের সেনাসদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কনসার্ট টিম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য মারাঠা লাইট ইনফেন্ট্রি, আসাম রেজিমেন্ট এবং সিক্সথ লাইট ইনফেন্ট্রি রেজিমেন্টকে সম্মানিত করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা মাননীয় গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি এবং ভারতীয় সেনাবাহিনির ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার ইন চিফ লে. জেনারেল অভিকৃষ্ণ এই তিন দলের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। ১৭ ডিসেম্বর সকালে আমন্ত্রিত অতিথিদের ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পরিদর্শন এবং সন্ধ্যায় ছিল গঙ্গা-হুগলি নদীতে নৌ ভ্রমণ ও নৈশভোজ। অতিথিরা তাজ বেঙ্গল হোটেলের বিশ্বমানের অসাধারণ আতিথেয়তা, ইস্টার্ন কমান্ডের ভারতীয় সৈনিকদের সৌজন্য ও শ্রদ্ধা এবং সার্বক্ষণিক দেখভালের এক বিরল অনুভূতি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। উৎসবে অংশগ্রহণকারী সবাই মনে করেন, শুধু উন্নয়ন কর্ম দিয়ে উভয় দেশের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন উভয় দেশের মধ্যে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। এখন আমাদের সেই কাজে গুরুত্ব দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ হবে নতুন শতাব্দীর নতুন প্রজন্মের নতুন অর্জনের লড়াই।

ড. আবুল আজাদ
চেয়ারম্যান, মুক্তিযুদ্ধ একাডেমি

ঐতিহ্য

কফিহাউসের সেই আড্ডাটা আজ...

আসিফ আজিজ

কলিকাতা, ক্যালকাটা, কলকাতা– নামের সঙ্গে, পরিবর্তনের সঙ্গে মিশে আছে ইতিহাস-ঐতিহ্যের মেটেল গন্ধ। ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ফরাসি, ব্রিটিশ বেনিয়াদের অনুরণন এখনও শোনা যায় পুরনো শহরটি অলিগলিতে। জন্মপুরুষসূত্রে এ শহরের সঙ্গে যোগসূত্র বহু পুরনো। তাই হয়তো বারবার টানে। ঘোরাঘুরির মত শুধু কলকাতা ঘোরাও তাই একটা নেশা। তবু শেষ হয় না খোঁজ-রহস্য।

সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে প্রেসিডেন্সি, সংস্কৃত কলেজ, কলেজ স্ট্রিটের সঙ্গে সখ্য থাকাটাও শহরের অলিগলিতে লেবু কিংবা আমপোড়া শরবত খাওয়ার মতই। সবশেষ মার্চে কর্মসূত্রে কলকাতা সফর ছিল। যত কাজই থাক একবার বইপাড়ায় ঢুঁ না মারলে ভাত হজমের পরিবর্তে অম্বল হয়ে যাবে নিশ্চিত! একদিন দুপুরের পর আলো একটু পড়তেই তাই বেরিয়ে পড়া।

মৌলালি থেকে চিপা যানজটের রোড ধরে ৬ রুপিতে সোজা কলেজ স্ট্রিট। পুরনো বইয়ের গন্ধ মাখতে মাখতে প্রেসিডেন্সি কলেজ রোড ধরে এগোনো।

এর মধ্যেই দাদা কি বই লাগবে... পুরনো পত্রিকা আছে কিন্তু আমার কাছে ইংরেজি চাইলে এদিকে দাদা... শুরু হয়ে গেল।

অবশ্য বিরক্ত নয়, চেনা-অচেনা মুখগুলি দেখতে দেখতে এগোতে ভালই লাগে প্রতিবার।

দুটি ট্রাম ঠং ঠং ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে গেল মাঝরাস্তা ধরে। বিকেলে শিক্ষার্থীদের ঘরে ফেরার তাড়া তো আড্ডাবাজদের জড় হওয়ার তাগিদ। দ্বিমুখী চাপ তাই সড়কে। প্রেসিডেন্সির গেটের উল্টোদিকের বাঁয়ের গলিতে ঢুকলেই বিখ্যাত সব পুরনো প্রকাশনী। এখনও মানুষ লাইন ধরে যে বই কেনে সেটা দেখার জন্যও ঢুঁ মারতে হবে এ অঞ্চলে।

উত্তর কলকাতার বিখ্যাত ইন্ডিয়ান কফি হাউসও এখানে। সামনেই সংস্কৃত কলেজ। কফি হাউস মানে গৌরীপ্রসন্নের লিরিকের কফি হাউস, সুপর্ণকান্তি ঘোষের সুরের কফি হাউস, মান্না দে-র দরাজ কণ্ঠের কফিহাউস। বইপাড়ার ভিড় ঠেলে এক গ্লাস আমপোড়া শরবত খাওয়ার লোভ সামলানো মুশকিল। সাত-পাঁচ না ভেবে শরবতে প্রাণ জুড়িয়ে এগোনো।

১৫ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি সড়ক। পুরনো ভবনের দোতলার সিঁড়ির কাছে যেতেই গমগম আওয়াজ। দেয়ালে টেরাকোটা কাজ। খানদশেক সিঁড়ি ভাঙতেই নজরে এল নিয়ন আলোয় লেখা *কফি হাউস*।

ওরে বাবা! কি আওয়াজ ভেতরে! বসার জন্য মিনিট দশেক ঘুরেও জায়গা পাওয়া গেল না। কখন কোন টেবিল থেকে কে উঠছে সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে দেখাও অস্বস্তিকর। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় গিয়েও দেখা গেল একই চিত্র। কিন্তু আড্ডাবাজদের চেহারা-পরিচ্ছদ দেখে বোঝা গেল নিছক আড্ডা নয়, তারা কাজের আড্ডায় বসেছেন বেশি। কবি-লেখক-শিল্পীই হবেন হয়তো! প্রেমিকযুগলও আছে কিছু।

কফি হাউসে এটা প্রথমবার নয়, তবু হঠাৎ মনে হল, কে বলেছে কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আর নেই! দিব্যিতো চলছে আড্ডা। সঙ্গে থাকা প্রবীণ কবি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নৃপেন চক্রবর্তী কথার খেই ধরে বললেন, সত্যিতো! বহু বছর ধরে আসছি এখানে। কিন্তু আড্ডাতো কমেনি। বরং বাড়ছে।

বিশাল উঁচু ছাদ। মাঝে চৌকো জায়গা পুরো নিচ থেকে দোতলা পর্যন্ত খোলা। দোতলার কিছু অংশ চারপাশ থেকে ছাদ দেওয়া। সেখানে বসে দেখা যায় নিচটা। দেয়ালে আবার ঝোলানো বিভিন্ন পেইন্টিংস। উপরে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখলাম কারা আসছে, ঢুকছে আড্ডা দিচ্ছে, তাদের বয়সটাই বা কেমন। দেখা গেল প্রবীণ থেকে যুবক-কেউ কম নয়। সমানে সমান। তবে গৌরীবাবু কেন লিখেছিলেন অমন অমর কথা! নিচে গিয়ে বসেও দেখা গেল একই চিত্র। চেয়ার পাবার প্রতিযোগিতা। কর্মীদের অর্ডার করলেও কফি হাতে পেতে পেরিয়ে যায় ১০-১৫ মিনিট। তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। আড্ডার তো আর সময় বেঁধে দেওয়া নেই।

'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই...' মান্না দে-র সেই গানের সঙ্গে কেউ মেলাতে পারবে না অন্তত শনিবারের কফি হাউসকে। তবে মান্না দে-র জায়গা থেকে হয়তো হিসেব সহজ। বিখ্যাত গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার অসুস্থ অবস্থায় ট্রেনে বসে সিগারেটের প্যাকেটে গানের শেষ যে স্তবকটি রচনা করেছিলেন সেখানেই রয়েছে সে হিসেবের সহজ উত্তর।

'সেই সাতজন নেই আজ টেবিলটা তবু আছে/ সাতটা পেয়ালা আজও খালি নেই/ একই সে বাগানে আজ এসেছে নতুন কুঁড়ি/ শুধু সেই সেদিনের মালি নেই/ কত স্বপ্নের রোদ ওঠে এই কফি হাউজে কত স্বপ্ন মেঘে ঢেকে যায়/ কতজন এল গেল কতজনই আসবে/ কফি হাউসটা শুধু থেকে যায়।'

মান্না দে-র আমলের 'সেই আড্ডাটা' রূপ বদলেছে গৌরীবাবুর কথা মতই। শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের আড্ডাটা আজও আছে। এখনও কফি হাউসে আসেন লেখক চলচ্চিত্র অভিনেতা শিল্পী তরুণ রাজনীতিক। মুখগুলো বদলেছে, বদলায়নি মুখোশ।

অ্যালবার্ট হলে পঁয়ষট্টিজন ট্রাস্টি ১৯৫৮ সাল থেকে চালাচ্ছেন কফি হাউস। তারাই মালিক, তারাই কর্মচারী।

কফি হাউসে কি আছে আগের সেইজৌলুস? মান্না দে, গৌরীপ্রসন্ন, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়রা তো সবসময় থাকেন না, থাকবেন না। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে নতুন আলো ফেলবে সেই যুগের তারুণ্য।

ক্যাশে বসে তপন পাহাড়ি বলছিলেন, আমি বাইশবছর হল কাজ করছি কফি হাউসে। আমার বাবা গোপাল পাহাড়ি কাজ করেছেন চল্লিশ বছরের বেশি। মান্না দে-কে কাছ থেকে দেখেছি। সবশেষ বেশি পরিচিত লেখকদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিয়মিত আসতেন। তবে একসময় কফি হাউসে সব শ্রেণীর মানুষ ঢুকতে ভয় পেতেন, এখন সেটা কেটে গেছে। সবাই এখন এখানে আসে। বসার জায়গা পাওয়া যায় না।

এখন প্রচুরসংখ্যক বিদেশি প্রতিদিন কফি হাউসে আসে বলেও জানান তিনি।

আশেপাশে বিখ্যাত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নামী প্রকাশনী, খাবারের দোকান, শতবর্ষী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ভবন কলেজ স্ট্রিটকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। সমরেশ মজুমদারের বিখ্যাত নায়ক-নায়িকা অনিমেষ, দীপান্বিতা কিংবা কবির সুমনের গানেও উজ্জ্বল এ বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্র।

কিন্তু কফি হাউসে কি আছে আগের সেইজৌলুস? অনেকে গানের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেন। মান্না দে, গৌরীপ্রসন্ন, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়রা তো সবসময় থাকেন না, থাকবেন না। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে নতুন আলো ফেলবে সেই যুগের তারুণ্য।

মোটা চশমা পরে কফির কাপে ধোঁয়া উড়িয়ে যে লোকটি জমিয়ে রেখেছেন আড্ডা, সেই হয়তো নিখিলেশ, মইদুল। তিন-চার ঘণ্টার আড্ডায় যে লোকটি চারমিনার ঠোঁটে জ্বালিয়ে কথার বুলি ঝাড়ছেন কিংবা কোণায় বসে যে মেয়েটি ক্লাস শেষে এসে বসেছে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে, সেই হয়তো গানের কোন খোলস বদলানো সুজাতা।

কফি হাউসের আড্ডা প্রসঙ্গে কবি নৃপেন চক্রবর্তী বললেন, 'কফি হাউস কেমন আছে, আড্ডা কেমন চলছে সেটা তো এখানে বসেই দেখতে পাচ্ছ। টেবিল খালি পাওয়া যায় না। আমরা কবিবন্ধুরা এসেছি আড্ডা দিতে। প্রবীণদের পাশপাশি যে-সব তরুণ এখানে আসছে তারাও কোন না কোনভাবে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। তুমি খোঁজ নিয়ে কথা বলে দেখতে পার। অল্প কিছু লোক হয়তো আসে দেখতে কিংবা বিখ্যাত কফি হাউসে এককাপ কফি পান করতে। আড্ডাটা মোটেও হারিয়ে যায়নি, কমেনি।'

নিচতলায় ৫৪টি টেবিলে বসতে পারেন ২৫০ জনের বেশি। ছোট্ট টেবিলটাতে ৬-৭ জন ঘিরে না বসলে যেন আড্ডাটা জমে না। ওপরতলায় রয়েছে ৪৫টি টেবিল। তবে পুরনোদের বেশি পছন্দ নিচতলা। এটিকেই তারা মূল কফি হাউস মনে করেন। ওপরে অপেক্ষাকৃত তরুণ ও যুগলদের ভিড় বেশি। সব মিলে চারশোজনের মত একসঙ্গে বসে আড্ডা দিতে পারেন এখানে। জানাচ্ছিলেন তপন।

কর্মীরা পোশাকে সেই আগের আভিজাত্য এখনও ধরে রেখেছেন। রাখবেনই-বা না কেন, তারাই তো সব কফিহাউসের। ট্রাস্টির মাধ্যমে চললেও ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ নজর রয়েছে কফি হাউসের প্রতি। মাত্র চার হাজার টাকা নামমাত্র মাসিক ভাড়ায় চলে প্রতিষ্ঠানটি।

কফি হাউসে কিন্তু শুধু কফি পাওয়া যায় না। এখানে পাঁচ পদের কফির পাশাপাশি চায়নিজ আইটেম এবং বিভিন্ন স্ন্যাকস্‌ও মেলে। দামও তত বেশি নয়। কফি মেলে ১৭ থেকে ৩৮ টাকার মধ্যে। ক্রিমসহ কোল্ড কফির দাম সবচেয়ে বেশি।

কলকাতার শত ঐতিহ্যের অংশ এ কফিহাউস। মান্না দে-র গানটিও হয়ে গেছে ঐতিহ্যের অংশ। দেশ-বিদেশের যারা এখনও কফিহাউসে যান, মাথায় নিয়ে যান মান্না দে-র গান। অতীত মাঝেমধ্যে ফিরে আসে বর্তমানের কাছে, বর্তমান যায় অতীতে। কফি হাউস থেকে যায় তার জায়গায়। মুখগুলো বদলায়, বদলায় না শুধু মুখোশ!

আসিফ আজিজ ভ্রমণলেখক, সাংবাদিক

কোন এক নবুতন

সালেহা চৌধুরী

ছোটগল্প

কলমি শাক আর লাল মোটা চালের ভাত খেয়ে কোনমতে দিন পার করে নবুতন। স্বামী শহরে গেছে দালান তৈরির 'সাইটে' কাজ করতে। দুই বার এসেছিল। একবার শাড়ি আর একবার একটা ম্যাক্সি নিয়ে। মাক্সি ও বাড়িতে পরে। শাড়ি বাইরে। খলপার বেড়া দেওয়া একঘরের একটা বাড়ি। বাড়িটা ওর স্বামী আজিমুদ্দির। বারান্দায় রান্না। দিন ভাল থাকলে উঠোনে। কলমি শাক রাঁধতে এক ফোটা তেল পাশের বাড়ির রহিমাখালার কাছ থেকে চেয়ে এনেছে।

– ওনার আসার সময় হয়ে গেছে। তেল আনলে তোমার তেল শোধ দেব।

– থাক আর এক ডাবু তেল শোধ দিতে হবে না। তোর ওনার এবার যে আসতে এত দেরি হচ্ছে? ঘটনা কী?

– কী জানি। বোধহয় কাজের খুব চাপ।

রহিমাখালার স্বামী গ্রামে থাকে। অন্যের জমি চাষ করে। নিজের এক-আধবিঘা জমি আছে। সেখানে মরিচ, আল, সবজি,বাঙ্গি লাগায়। ভালই আছে বলতে হয়। কারণ নবুতনের মত ভাত-তেলের কষ্ট নাই। তিনবেলা ভাত খায় ওরা। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং সাপার।

নবুতনের জীবনটাই এমন। কোন কালে বানে বাপ গেল। তারপরের বছর বনের ভেতর মেটে আলু তুলতে গিয়ে মা গেল। সাপে কেটেছিল মাকে। এরপর থেকে এর-ওর দয়ায়। কখনো মামা, কখনো চাচা। তারাতো কেউ জমিদার নয়। কাজেই একটা খাবার মুখ বেশিদিন কোনখানে খাবার পায় না। ফলে আজ এখানে, কাল সেখানে। এই করতে করতে বয়স যখন সতেরো হল আজিমুদ্দি নামের ঘরামি দেখে ফেলল তাকে। বাঁশ বনে উদাস হয়ে কী যেন ভাবছিল ও। পা ছড়িয়ে ভাবছে জীবনের কথা, ভাতের কথা, পরনের কাপড়ের কথা এবং একটা মুরগির কথা, যার ডিম ও বেচতে পারবে।

আজিমুদ্দি পছন্দ করল। ওদের বিয়ে হয়ে গেল। কোন এক চাচা দুইখানা ডেকি মুরগি আর তেলের পোলাও করে পাঁচজন মানুষকে খাইয়ে বিয়েটা সেরে ফেলল।

একখানা নতুন লুঙ্গি আর একখানা পাঞ্জাবি পেয়েছিল আজিমুদ্দি। প্রথম প্রথম ভাতের কষ্ট যখন গেল বেশ ভাল লাগছিল ওর। সকালে কানাতোলা থালার এক থালা পানতা না হলে শীতে কড়কড়া, দুপুরেও ভাত আবার রাতেও ভাত। বছরখানেক সুখের সময়। তারপর একদিন আজিমুদ্দি বলল– আমি শহরে যাব। বিল্ডিং সাইটে কাজ করব। এখানে আর তেমন কাজ নেই। বলল নবুতন– আমারে নিবা না।

– আমার নিজের বলে থাকবার জায়গা নাই, তরে ক্যামনে নিই বল?

– এখানে আমারে কে দেখব?

– গতর আছে না? খাটাখাটনি কইরা চলবি। এই একঘরের বাড়ি তো থাকলোই। এমনি কইরাই তো চলতি।

– আমারে শহরে নিলে আমিওতো সেখানে এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করতে পারতাম।

– না। এখন নয়। নিজের আগে একটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই হোক। তারপর নিমু।

আসল কথা নবুতনের গোশতের স্বাদ জানা হয়ে গেছে, হাড়ের ভেতর তেমন গোশত নাই। এক বছরে একটু চেকনাই হলেও সেটা আর আজিমুদ্দিকে ধরে রাখতে পারছে না। আজিমুদ্দি লোকটাই এমন। মেয়ে চাখার ওস্তাদ। আগে দুইবার বিয়ে করেছিল। সে-সব বেশিদিন টেকেনি। ওদের আবার বিয়ে হয়ে গেছে। ওরা কারো তিন নম্বর কারো চার নম্বর বউ। ফেলে গেলে একদিন নবুতনও তাই করবে। কিন্তু নবুতনের কালো পাতিলের তলা রঙ আর হাড়হাড্ডি শকুনেও পছন্দ করে না, করবে আর একজন পুরুষ! চিরকালই নবুতন এমন। হাড়সর্বস্ব এক নারী। এমন শরীর বিদেশে মডেল হলে বেশ ভাল থাকে। যাদের মোটা হবার সমস্যা নাই। 'মেটাবলিজম' ঈশ্বরের দেওয়া। কিন্তু গ্রামের পুরুষ ওকে দেখলেই নাক সিটকায়– শরীরে শাঁসমাস কিছু নাই? কোন ঘাটের মরা তুই?

নবুতন হুড়কো দিয়ে কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। তেমন রাত নয়। একটা নড়বড়ে চোকি একমাত্র আসবাব। কেরাসিন পোড়ানো যায় না বলে ও শুয়ে পড়ে। সৌর-বিদ্যুৎ প্রায় সকলের বাড়িতে। ওর আসেনি।

বাইরে একটু শব্দ। কে আবার এত রাতে। পাশের বাড়ির রহিমাখালা কী? ফট করে রহিমাখালা ওর বাড়িতে আসে না। ওদের সম্পর্ক অনেকটা রাজা-প্রজার মত। হঠাৎ মনে হল কোন একটা খবর দিতে এসেছে বোধহয়। ও হুড়কো খোলে। অন্ধকার ঘর। রহিমাখালার হাতে একটা লণ্ঠন। বলে– ও তুই হুড়কা দিছিস? এই বলে ঘরে আসে। নবুতন তাড়াতাড়ি বসতে বলে। চোকির কাঁথা টান টান করে। হাতে ছোটবাটিতে এক বাটি গুড়ের পায়েস। বলে– নে। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারে না নবুতন। বলে– এত কষ্ট কইরা এত রাতে আমার জন্য শির্ণি আনছো?

– থাক। কষ্ট আর কী। এই বলে একটু থামে। তারপর বলে তুই ঘুমা। আমি যাই। মনে মনে ভাবে কেবল ক্ষির দিতেই কী রহিমা খালা আসছেন? আর কোনও কথা নাই? তারপর বলে– শোন এই নিয়া দুঃখ করবার কিছু নাই। তোর স্বামী শহরের কোন এক ইট বওয়ানি মেয়েরে শাদি করছে। কালই শাদি হইছে। আবুলে শহর থেকে আজই আসছে। ও বলল। এই বলে একটা ছোট হারিকেন হাতে দপ দপ আলোতে রাহিমা খালা চলে যায়। যাবার আগে বলে– বাড়িত একটু কামকাজ আছে। কাল একবার আসিস। অর্থাৎ একথালা ভাতের আশ্বাস। না রহিমাখালা মানুষ খারাপ না। যদিও দুখের খবর দিতে কামকাজ ফেলে ছুটে আসে। ভাল খবর থাকলে কী আসত? ভাল খবর? আজ পর্যন্ত কোন ভাল খবর আসেনি ওর জীবনে।

হাতে ছোট ক্ষিরের বাটি। খুব কী দুঃখ মনে? কেমন বোবা অসার শরীর। জানে ও এমনই হবে। বলছিল আজিমুদ্দি– এ কেমন ভাগাড়ের গাই রে তুই। গায়ে গোশত নাই। খালি হাড্ডি ঠক ঠক। তখনি জানে ও, আজিমুদ্দি এবার শহরে গিয়ে গোশত গোশত এমন এক বকনা মেয়ে খুঁজবে?

পরদিন ও-বাড়িতে কাজ শেষ করে আসবার সময় রহিমাখালা আর একটা সংবাদ দেয়। বলে– শোন মিজান মিয়ার বউ মরছে। আটজন গান্দা পোলাপান। মিজান মিয়ার শরীরটাও ভাল না। বাত। একজন মেয়েমানুষের দরকার। যে ওর রানদাবাড়া করব। ঘরদোর পরিষ্কার রাখব। আটজন পোলাপান সামলাইব। বুড়া লোক। তোর হাড্ডি নিয়া তেমন খোঁটা দেবার মত অবস্থা নাই।

সব বুঝতে পারে ও। বিনাপয়সার চাকরানি যার রাত বলে কিছু নাই, দিন বলে কিছু নাই। কেবল কাজ আর কাজ। আরো জানে বাতের যখন জোর হয় বিছানায় পেশাব-পায়খানা নাকি করে এমন মানুষ। তার উপর আবার নাকি শ্বাসের কষ্ট!

বলে নবুতন– দেখি খালা, তোমারে পরে জানাই।

– জানা। খাওয়ার চিন্তা নাই এইটুকু কেবল বলতে পারি। ওর কয়েক বিঘা জমি আছে। বছরের ভাতের কোন কষ্ট নাই। নবুতন ভাবে দুইখানা শাড়ি আর দুইবেলা খুব বেশি হলে তিনবেলা ভাত, এর উপর তো আর কোনদিন ও কিছু চায়নি। তবে কী এত ভাবছে? বোধকরি একা থাকার ফলে ওর শরীরে বাঁশবনের একটু ঝিরে ঝিরে স্বাধীনতার বাতাস, একটু নিমফুলি সুখ সুখ সময়। তাই ও সহজে আর কোন দায়দায়িত্বের মধ্যে যেতে চায় না। আর তা ছাড়া বুড়া স্বামী সেটাও কী একটা কারণ? হতে পারে।

পরদিন একা একা বনের ভেতর যায় মেটে আলু তুলতে। নবুতন ভাল করে জানে কোথায় মেটে আলু পাওয়া যায়। ওর মত এত সহজে মেটে আলু কেউ তুলে আনতে পারে না। ওর মাও মেটে আলু তোলার কাজে দক্ষ ছিল। সেখানেই একদিন সাপ কাটল। মা চলে গেল। মায়ের মতই মেটে আলুর কপালটা ওর ভাল। জঙ্গলটা একটু ছমছমে। অনেকে ওখানে দিনে দুপুরে যায় না। ওর এসব ভয়ডর নাই। একা ঘরে থাকতে যেমন ভয় নাই, একা বনে মেটে আলু তুলতে যেতেও তেমন ভয় নাই। হাতে কোদাল। একটা কোদাল আর একটা শক্তপোক্ত চাঙারি রেখে গেছে আজিমদ্দি।

বড় বড় গাছেরা বনের ভেতর এক ধরনের অন্ধকার করে রাখে। ও খুঁজতে থাকে কোথায় সেই ঐশ্বর্য যার নাম মেটে আলু। একটু বসে। কোন এক গাছে পাখি ডাকে। কোন এক গাছের তলায় কিছু বনের ফুল পড়ে থাকে। দুটো বেজি চলে যায়। সরসর কে যেন শব্দ করে। যেই হোক এত কিছু নিয়ে ভাবলে চলে না। একদিন আমি শহরে যাব। বাসাবাড়িত কাম করব। তারপর ভাবে– কার সঙ্গে যাবে ও। বাস থেকে নেমে কোনদিকে হাঁটা দেবে? শহরের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম কিছুই তো চেনে না ও। যদি এবার আবুল আসে ও আবুলকে ধরবে ওকে শহরে নিতে। ওখানে গার্মেন্ট আছে। আরো কত কী। ভাবনা ফেলে এবার ওঠে। একফালি আলো একটা জায়গায়। ও জেনে যায় এখানে আছে মেটে আলু। কোদাল চালায়। মেটে আলু কোথায়? খানিক পর ঠন করে কেমন যেন শব্দ হয়। ও অবাক হয় এমন শব্দে। তারপর চারদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে কোদাল চালাতে থাকে। কয়দিন হল বেশ বৃষ্টি হয়েছে। ফলে অনেক গর্তের ভেতর লুকিয়ে থাকা পানের বাটার সমান একটা বাক্স উঠে আসে। সেই বাক্স যার ভেতরে খোপ খোপ চুন, খয়ের, সুপুরির জায়গা থাকে। মনে হয় ফুলকাঁসার তৈরি। ধুলো ঝেড়ে দেখে এখনো ঝক ঝক করছে। তাড়াতাড়ি শাড়ির তলায় সাবধানে রাখে। বাক্সের ডালা খোলে না। চুপচাপ বুকের ভেতর সেই বাক্স চেপে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। ভাগ্য তাহলে খুলে গেল ওর? এই বাক্সের ভেতর নিশ্চয়ই সোনা দানা কিছু আছে। দম বন্ধ হয়ে যায়।

দু'একজন প্রশ্ন করে– মেটে আলু পাইলি?

– না। এই বলে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ির দিকে আসে। বাড়িতে ঢুকে যাকে দেখে সে ওই মিজান বুড়া। কোনমতে লাঠি ভর করে কনের বাড়িতে এসেছে।

আপনি কী মনে করে? কোনমতে সে বাক্স চকির তলায় রেখে ও প্রশ্ন করে। বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে ওর। শরীরটা কেমন থর থর করছে। এই বুড়া আর সময় পায়নি।

– প্রথমে এক গ্লাশ পানি পান করাও।

ও পানি আনে। বলে মিজান মিয়া– আমারে তোমার পছন্দ হয় নাই?

বলে ও– একটু ভাবতে দেন। আমার শরীরডা ভাল না। ভাল হইলে আপনাকে জানাব। বুড়া আরো কিছুক্ষণ বসে থাকে। বলে– কালো হইলেও তোমার নাক-নকশা খারাপ না নবুতন।

ও একটু হাসে। বুকের শব্দ যেন শুনতে না পায় এমনভাবে দম ফেলার চেষ্টা করে।

আরো কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মিজান মিয়া বিদায় নেয় ভবিষ্যতের

একটা ডাল-ভাত-শাড়ির নকশা চোখের সামনে মেলে দিয়ে এবং একটু হেসে বুড়া তাকে আশ্বস্ত করে– যতটা বুড়া আমারে ভাবছ আমি ততটা বুড়া না।

দরজার ভাল করে হুড়কা লাগায়। একটু তেল পুড়িয়ে কুপি জ্বালায়। বার বার দেখে দরজা লাগল কিনা।

ঢাকায় ইঁট বহনের সেই মানুষটা একটু বুড়ো। যে 'সাইটে' এটা ওটা করে। আজিমুদ্দিনের বন্ধু। বলে– কোন গ্রাম থেকে আসছ আজিমুদ্দি। বলে আজিমুদ্দি– সুখউজানপুর। বিক্রমপুর থেকে আরো কয়েক মাইল উত্তরে।

– সুখউজানপুর। বিড়িতে সুখটান দিয়ে লোকটা কী ভাবতে থাকে। বলে চোখ খুলে– ওই গ্রামে আগে হিন্দুরা ছিল। ওই গ্রামটা হিন্দুদের গ্রাম ছিল।

– ছিল। বাংলা দেশ হওনের বছর সবগুলো ভাগতে গিয়ে বর্ডার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তারপর আর কেউ ফিরে আসেনি। এমনিতে ধরা পড়ে না। সেদিন একজন পাকিস্তানি সেখানে আসছিল বর্ডার দেখতে। অরা আর পালাতে পারে নাই।

– বাড়িঘর কারা দখল করছে?

– সেইসময় যারা মাস্তান। আমার বাবা দাদার ভাগে কিছু পড়েনি। যেমন আমার ভাগ্য তেমনই আছে।

লোকটা বিড়িটা বুজিয়ে ফেলে। পা লম্বা করে দুপুরের ভাত খাবার ফাঁকে কোন এক গল্প করবে বলে একটু নড়ে চড়ে বসে। বলে– আমার বাবার কাছে একটা গল্প শুনছিলাম। বলতো আমার বয়স কত?

– তোমার বয়স ষাট-সত্তুর।

– না। পাঁচপঞ্চাশ। তবে আমার বাবা মারা যায় আশি বছরে। বাংলাদেশের মারামারি কাটকাটিতে তার একটা হাত যায়। ওই দিয়া এটা সেটা কইরা জীবন চালাইত।

– তুমি বললা তোমার বাবার কাছে একটা গল্প শুনছ? কী গল্প?

– শুনছিলাম তোমাদের গ্রাম ওই সুখউজানের হিন্দুরা তাদের বউ বাচ্চার যতটুকু সোনা-দানা ছিল সব দিয়া একটা পানের বাটা বানাইয়া মাটির তলাত পুঁতে রাখছিল। গ্রামের সকলের সোনা জড়ো করে রাতারাতি কামটা সারে। ওই গ্রামেই একজন ভাল সোনার কাজ জানা মানুষ ছিল। তবে শুনছি পানের বাটা বাক্সটা সোনার না। সেটা কাঁসার। তবে তার ভেতরে যে খোপ আছে সেগুলোর ঢাকনি সব সোনার। সব মিলে ভরি পঁচিশেক বা তারো বেশি সোনা তো হাইব। একশো ভরিও হইতে পারে।

– কে করল এমন গল্প তোমার কাছে?

– একটা বুড়া। পালাইয়া যাওয়ার আগে ধরা পড়বার আগে আমার বাপেরে গল্প করে। আমার বাপ আর সুখউজানিয়া গ্রামে গিয়া সেইটা নিয়া খোঁজাখুজি করে নাই। আমিও করি নাই। ওইখানে কোথাও নাকি এক নিমতলির জঙ্গল আছে, সেখানে কোথাও পোঁতা আছে। সেখানে নাকি আবার বড় বড় শাপও আছে। এই বলে বুড়ো দুপুরের খাবারের পর একটু চোখ বন্ধ করে।

নিমতলির জঙ্গলে তো নবুতন যায় মেটে আলু তুলতে। শাক আনতে। অনেকদিন থেকে ওই জঙ্গলই অরে বাঁচাইয়া রাখছে। তবে তোমার কথা বিশ্বাস করলাম না। গ্রামের মানুষের এত সোনা?

– কোন গাঁ সেইটা দেখবা না। কাঁসার জিনিসের দোকানদার, কাপড়চোপড় বিক্রি, আরো নানা দোকান দিয়া তাগো অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। আমি তো কমই বললাম। তারো বেশি হইতে পারে। এর মধ্যে দু'একজন জমিজমাওয়ালা চাষাও ছিল।

– মনে হয় এমন একটা গল্প বানাইয়া কইতে তোমার ভাল লাগতাছে।

– মিয়া বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার। আমি বললাম তুমি শুনলা। এই বলে বুড়া চোখ বন্ধ করে।

নবুতন তো রোজদিনই যায়। মাটি খোঁড়ে। শাক তোলে। একদিন ও জিনিসটা দেখল না?

– ওইটা কী মাটির উপর যে দেখব? আর কথা বলবা না।

ঠিকই বিশ্বাস করেছে আজিমুদ্দি। কেবল ভান করেছে বিশ্বাস না করার। সেইরাতেই বাড়িতে ফিরে আসে আজিমুদ্দি। জঙ্গলটা বেশ বড়। ঠিক কোন গাছের নিচে পোঁতা সেটা নাকি কেউ জানে না। যারা জানে তারা আর কেউ নাই। চল্লিশ বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেছে।

দরজার হুড়কো বাইরে থেকে খোলা যায়। সেটা কেবল আজিমুদ্দি আর নবুতন জানে। একটু উঁচুতে তুলে দরজাটা খোলা। পচা দরজা ফট করে খুলে যায় তখন। বুকের উপর কী যেন নিয়ে গভীর ঘুমে অচেতন নবুতন। আজিমুদ্দির আসার খবর টের পায় না। কী সুখে ঘুমায় ও। মনে মনে ভাবছে নবুতন এই ফুলকাঁসার পানদানি বেচলে দুইশো টাকা হইতে পারে। তা দিয়াতো একটা ভাল শাড়িও হয় না। সেই দুইশো টাকার সুখে ঘুমায় ও। আজিমুদ্দি তাকিয়ে নবুতনকে দেখে। মনে মনে ভাবে ভোর ভোর থাকতে কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। আর নবুতন পাশ ফিরতেই জিনিসটা নিচে পড়ে।

তখনো সকাল হয়নি। ফুলকাঁসার সেই পানের বাটা যার ভেতরে খোপ। আর খোপের সবগুলো ঢাকনি আর একটা খোপ সোনার এমন একটা অসাধারণ জিনিস নবুতনের বুক থেকে মাটিতে, মাটি থেকে সোজা আজিমুদ্দির কাছে। সমস্ত পৃথিবী আর আশমান যদি আজ ভেঙে মাথায় পড়ে তাহলেও এতটা অবাক হবে না। বলেছিল সেই বুড়ো– শোনা গল্প। পুরোটা সোনার, না ভেতরের খোপগুলো সোনার না খোপের ঢাকনিগুলো সোনার ঠিক জানি না। এত চক চক করে চল্লিশ বছর পর একটা ফুলকাঁসার পানদানি? ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে খুব সাবধানে বের হয়। দরজা বন্ধ হল কি হল না সে নিয়ে কে ভাবছে এখন? আরো কতগুলা মেয়েমানুষ বশ করতে পারবে ও ভাবতেই চন চন করে ওঠে যৌবন। একসঙ্গে তিনজনকেও রাখতে পারবে। দুইজনে ঝগড়া করবে। আর তিনজনেরে নিয়া ঘুমাইবে। মজাই আলাদা। নবুতন একবার কী যেন এক স্বপ্ন দেখে আঁ আঁ করতে করতে আবার ঘুমায়। গতকাল বড় ধকল গেছে। তারপর শাড়ি দিয়ে মুছতে মুছতে জিনিসটা চকচকে করতেও অনেক সময় খরচ হয়েছে। তারপর জিনিসটারে বুকে করে ঘুমিয়ে গেছে। মেটে আলুর দাম দশ টাকা, মাতবরের ছোট বউ খুশি থাকলে বিশ টাকায় কেনে। মনে মনে ভাবছে আগামীকাল জিনিসটা মাতবরের ছোট বউয়ের কাছে বেচবে। তার দরাজ দিল। দুইশো টাকার জয়াগায় তিনশো টাকা দিতে পারে। একটা ছাপা ছাপা শাড়ি কিনবে। অনেকদিনের ইচ্ছা।

পরদিন রহিমা খালার ডাকে ঘুম ভাঙে– তুই না হয় পাতিলের তলা। বয়সটা তো আর পাতিলের তলা না। এমন করে দরজা খুইলা কেউ ঘুমায়?

উঠে বসে নবুতন। ওর মনে হয় কালকের পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্ন। খোয়াব ছাড়া আর কিছু না। সে চোখ ঘসে। আজ আবার কী দুঃসংবাদ?

– মিজান মিয়া কাল তোর এখানে আসছিল নাকিরে?

– হ। কী হইছে?

– ভালমন্দ কিছু বলছিলি নাকি?

– না। খালি কইছি আমারে একটু সময় দেন।

বাড়ি গিয়া শ্বাসের টান। এইতো খানিক আগে বুড়া শেষ। আটজন পোলাপান। অগো এক চাচা আসছে। জমিজমা নিব। পোলাপানরেও নিব। তোর আর বুড়ারে বিয়া করা লাগব না।

খবর দিয়ে চলে যায় রহিমাখালা।

এই কথা শুনে কী খুব একটা কষ্ট? তিন বেলা ভাতের ঘটনা ও ভুলে যায়। কিন্তু জঙ্গলেও তো আজকাল মেটে আলুর বড় কমতি। এখন আরো কতজন যায় আলু খুঁজতে। শাক তুলতে। গিমা শাক, থানকুনি শাক আরো কত কিছিমের শাক।

সরোবরের মত ঝিলে আল্লাহর রহম ঢালা কলমিশাকের ঢল। নবুতন দেখে সেখানে গলায় লাল আর নীল একটা পাখি এসে বসেছে। একটা পানির সাপ হেলতে দুলতে চলে গেল। হঠাৎ কোন কারণ নাই এমন দৃশ্যে বলে ওঠে– কী সুন্দর এই ঝিল। কত শাক। আল্লাহর রহম।

উপর থেকে ভাগ্য দেবতার স্ত্রী ওর স্বামীকে বলে– ওর ভাগ্যটা এমন করলে কেন?

দেবতা বলেন– আমার কী দোষ? সোনা আর ফুলকাঁসার ভেতরে যে পার্থক্য করতে পারে না তার অবস্থা আমি কী করে ঠিক করি বল?

– ও কখনো সোনা দেখেছে না ফুলকাঁসা দেখেছে?

দেবতা উত্তর দেন না।

সালেহা চৌধুরী লন্ডনপ্রবাসী সাহিত্যিক

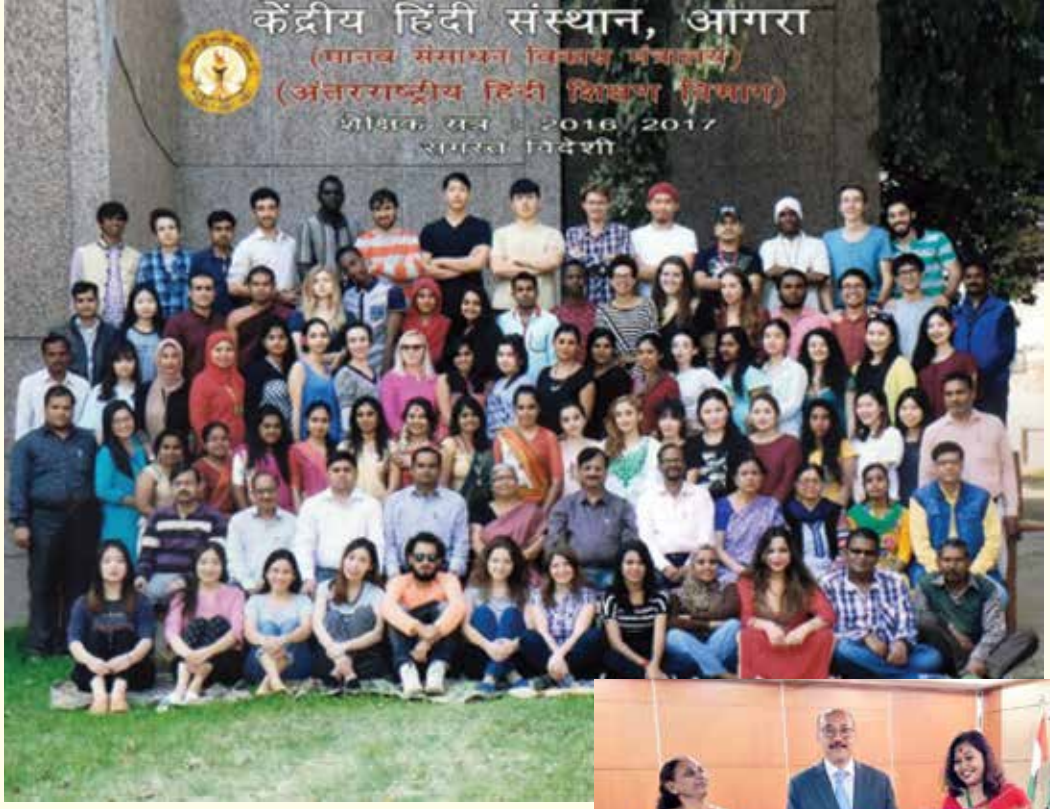

শিক্ষা

ভারতের কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে বাংলাদেশের প্রথম অংশগ্রহণ

অঞ্জয়রঞ্জন দাস

কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থান একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ১৯৬১ সালে উত্তর প্রদেশের আগ্রায় প্রতিষ্ঠা করে। এটি পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় হিন্দি শিক্ষণ মণ্ডল। দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, গৌহাটি, শিলং, মহীশূর, ডিমাপুর, ভুবনেশ্বর এবং আহমেদাবাদে সংস্থানটির আটটি শাখা আছে। কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে বিদেশী শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত 'আন্তর্জাতিক হিন্দি শিক্ষণ বিভাগ'-এর ওপর এবং ভারতের অহিন্দিভাষী প্রদেশের শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত 'অধ্যাপক শিক্ষা বিভাগ'-এর ওপর। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা ভারত সরকারের পূর্ণকালীন বৃত্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে আসেন। কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থান বিদেশী শিক্ষার্থীদের কাছে অধিক সমাদৃত বিবিধ এবং বর্ণাঢ্য কার্যক্রম, অভিজ্ঞ এবং বন্ধুভাবাপন্ন শিক্ষকমণ্ডলী, ছেলেমেয়েদের জন্য আন্তর্জাতিকমানের পৃথক আবাসিক হোস্টেল, বিস্তৃত সবুজ ক্যাম্পাস এবং সার্বক্ষণিক উচ্চ নিরাপত্তাসেবা প্রদানের জন্য।

বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মত আমি এবং নার্গিস সুলতানা ঢাকাস্থ ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের পিএইচএ স্কিমের পূর্ণকালীন বৃত্তি নিয়ে আগ্রার এ স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে নয় মাসব্যাপী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে হিন্দি ভাষা ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাই। আমাদের মেয়াদকাল ছিল ২০১৬-র ৪ আগস্ট থেকে ২০১৭-র ২ মে। ৫ আগস্ট দুপুর সাড়ে ১২টায় আমরা দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানের প্রতিনিধি আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তাজমহলনগরী আগ্রায় নিয়ে আসেন।

২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে পৃথিবীর ৩১টি দেশের ৯০জন শিক্ষার্থী ভারত সরকারের পূর্ণকালীন বৃত্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে আসেন। শ্রীলংকা থেকে সর্বাধিক ১৭জন, থাইল্যান্ড থেকে ৯জন, মিশর থেকে ৭জন, মঙ্গোলিয়া ও কোরিয়া থেকে ৫জন করে, চিন ও পোল্যান্ড থেকে ৪জন করে, আফগানিস্তান, চাদ ও রাশিয়া থেকে ৩জন করে, বাংলাদেশ, বুলগেরিয়া, মায়ানমার, পর্তুগাল, সুরিনাম, তাজিকিস্তান, লিথুয়ানিয়া, ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো ও ভিয়েতনাম থেকে ২জন করে এবং আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, ক্রোয়েশিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, ফিজি, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, মরিশাস, মেক্সিকো, স্লোভাকিয়া, ইউক্রেন ও উজবেকিস্তান থেকে ১জন করে শিক্ষার্থী এসেছিলেন। তবে ১১জন শিক্ষার্থী পারিবারিক কারণে পরে নিজেদের দেশে ফিরে যান।

সব দেশের শিক্ষার্থী কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে পৌঁছনো তথা পুলিশ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে একটি লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ৭৯জন শিক্ষার্থীকে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে নীচের চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়:

১. হিন্দি ভাষা দক্ষতা সার্টিফিকেট কোর্স (শ্রেণি-১০০)= ৩৫ জন।
২. হিন্দি ভাষা দক্ষতা ডিপ্লোমা কোর্স (শ্রেণি-২০০)= ২৬ জন।
৩ হিন্দি ভাষা দক্ষতা উচ্চ ডিপ্লোমা কোর্স (শ্রেণি-৩০০)= ০৮ জন।
৪. হিন্দি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স (শ্রেণি-৪০০)= ১০ জন।

আমি আর নার্গিস সুলতানা হিন্দি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। ২০১৬-র সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে পাঠদান শুরু হয়ে যায়। হিন্দি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে মোট ৭০০ নম্বরে যে-সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেগুলো হচ্ছে– ভারতীয় সংস্কৃতি এবং দর্শন, হিন্দি শিক্ষণ এবং সামগ্রী নির্মাণ, সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান এবং হিন্দি ভাষা, পাঠাবলী: গদ্য এবং পদ্য, প্রেমচাঁদ: এক বিশেষ অধ্যয়ন, গবেষণা: নীতি এবং পদ্ধতি, সংক্ষিপ্ত গবেষণা প্রবন্ধ ও মৌখিক পরীক্ষা।

সংক্ষিপ্ত গবেষণা প্রবন্ধে আমার বিষয় ছিল 'বাংলাদেশের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং ভারতীয় কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা: এক তুলনামূলক অধ্যয়ন'। নার্গিস সুলতানার বিষয় ছিল 'বাংলাদেশি লেখক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং ভারতীয় লেখক অমৃতা প্রীতমের সাহিত্যে নারী চেতনা: এক তুলনামূলক অধ্যয়ন'। কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে সহশিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল যোগ, জ্যোতিষশাস্ত্র, তবলা বাদন, সংগীত ও নৃত্য।

২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন, ড. গঙ্গাধর বানোডে, ড. যোগেন্দ্র সিংহ মীনা, সুশ্রী জানকি জেঠবানি, প্রফেসর মীরা সরিন, ড. কৃষ্ণগোপাল কপুর, শ্রীমতী প্রীতি গুপ্তা, শ্রী প্রমোদকুমার পাঠক, শ্রীমতী শালিনী শ্রীবাস্তব, প্রফেসর দেবেন্দ্র শুক্ল, ড. কেশরীনন্দন এবং শ্রী অনুপম শ্রীবাস্তব।

সহশিক্ষা কার্যক্রমে আমি যোগ (প্রশিক্ষক: ড. শর্মা / শ্রীমতী রশ্মি চৌহান), জ্যোতিষ (প্রশিক্ষক: ড. কিরণ জেটলি) এবং তবলাবাদনে (প্রশিক্ষক: শ্রী দীপক প্রভাকর) অংশ নিয়েছিলাম। অন্যদিকে নার্গিস সুলতানা সংগীত (প্রশিক্ষক: শ্রীমতী মিতা গাঙ্গুলি) ও নৃত্যে (প্রশিক্ষক: শ্রীমতী জ্যোতি খণ্ডেলবাল) অংশগ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে নয় মাসব্যাপী নিয়মিত পাঠদানের পাশাপাশি নিম্নলিখিত বর্ণাঢ্য কার্যক্রম আয়োজিত হয়– প্রথম শিক্ষাসফর, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন, প্রথম আন্তরিক পরীক্ষা, দীপাবলী পর্ব, হিন্দি-মিজো অভিধান'-এর মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভাগীয় সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা, অখিল ভারতীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতা, আন্তরিক অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা, বিদেশ মন্ত্রকের বিশ্ব হিন্দি দিবস উদ্‌যাপন, লোহড়ী পর্ব, ২৬ জানুয়ারি উদ্‌যাপন, বসন্ত পঞ্চমী পর্ব, বিভাগীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, তৃতীয় আন্তরিক পরীক্ষা, দ্বিতীয় শিক্ষাসফর, হোলি মিলনোৎসব, বার্ষিক পরীক্ষা ও সমাপন সমারোহ।

প্রথম শিক্ষাসফর

ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান প্রদানের জন্য ২০১৬-র ৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থান আয়োজিত প্রথম শিক্ষাসফরে সকল বিদেশী শিক্ষার্থীকে মোঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী ফতেহপুর সিক্রি, ভগবান কৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা এবং লীলাভূমি বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২০১৬-র ২৬ অক্টোবর কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানের নাজির মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক হিন্দি শিক্ষণ বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানের নির্দেশক প্রফেসর নন্দকিশোর পাণ্ডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আগ্রার পুলিশ মহাপরিদর্শক শ্রী সুরজিৎ পাণ্ডে।

দীপাবলী পর্ব

২৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানের গান্ধী ভবন প্রাঙ্গণে দীপাবলী পর্ব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রফেসর দেবেন্দ্র শুক্ল এবং জ্যোতিষী ড. কিরণ জেটলি দীপাবলী পর্বের উৎপত্তি এবং তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি দলীয় মন্ত্র পাঠ ও দলীয় তবলা বাদন পরিবেশনায় এবং নার্গিস সুলতানা দলীয় নৃত্য পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করি।

হিন্দি-মিজো অভিধান-এর মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

২ নভেম্বর আগ্রা শহরের সুরসদন মিলনায়তনে 'হিন্দি-মিজো অভিধান'-এর মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থান এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় হিন্দি শিক্ষণমণ্ডল, আগ্রার উপাধ্যক্ষ

ড. কমলকিশোর গোয়েঙ্কার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মিজোরামের রাজ্যপাল লে. জেনারেল নির্ভয় শর্মা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি দলীয় মন্ত্র পাঠ ও দলীয় তবলাবাদন পরিবেশনায় এবং নার্গিস সুলতানা দলীয় নৃত্য পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করি।

বিভাগীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতা

৯ ও ১০ নভেম্বর কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে বিভাগীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় সকল বিদেশী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। বরিষ্ঠবর্গ নিবন্ধ প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম স্থান এবং নার্গিস সুলতানা দ্বিতীয় স্থান লাভ করি। বরিষ্ঠবর্গ বির্তক প্রতিযোগিতায় নার্গিস সুলতানা প্রথম স্থান লাভ করেন। বরিষ্ঠবর্গ কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নার্গিস সুলতানা প্রথম স্থান এবং আমি দ্বিতীয় স্থান লাভ করি।

অখিল ভারতীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতা

১৬-১৮ নভেম্বর কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে অখিল ভারতীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানের সকল দেশী-বিদেশী শিক্ষার্থীর পাশাপাশি সর্বভারতীয় অহিন্দিভাষী প্রদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। বরিষ্ঠ বর্গ অখিল ভারতীয় বির্তক প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম স্থান এবং নার্গিস সুলতানা দ্বিতীয় স্থান লাভ করি। বরিষ্ঠ বর্গ অখিল ভারতীয় কবিতা আবৃত্তি ও নিবন্ধ প্রতিযোগিতায় নার্গিস সুলতানা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। বরিষ্ঠ বর্গ অখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল সর্বোচ্চ হওয়ায় আমাদের বিভাগ 'আন্তর্জাতিক হিন্দি শিক্ষণ বিভাগ'কে বৈজয়ন্তী পুরস্কার-২০১৬ প্রদান করা হয়। ২০১৬-র ১৮ নভেম্বর আমাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

বিদেশ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে বিশ্ব হিন্দি দিবস উদ্‌যাপন

বিদেশ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে ০৫ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে 'বিশ্ব হিন্দি দিবস' উপলক্ষে সকল বিদেশী শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক নিবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বরিষ্ঠ বর্গে আমি প্রথম স্থান এবং নার্গিস সুলতানা দ্বিতীয় স্থান লাভ করি। 'বিশ্ব হিন্দি দিবস' উপলক্ষে ২০১৭-র ১০ জানুয়ারি দিল্লিতে বিদেশ মন্ত্রকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের পুরস্কৃত করা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করায় কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র আমাদের দুই বাংলাদেশীকে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করতে বক্তৃতাদানের সুযোগ দেওয়া হয়। এ সুযোগ পেয়ে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। প্রফেসর অশোক চক্রধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী প্রীতি সরণ (সচিব বি.পূর্ব), অতিথি শ্রী রাজেশ বৈষ্ণব (যুগ্ম সচিব, হিন্দি/সংস্কৃত), অতিথি শ্রী বিপুল (যুগ্ম সচিব)। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন শ্রীমতী সুনীতি শর্মা। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে আমি, অর্তম (ইউক্রেন), বাসনা (শ্রীলংকা) এবং ইসুরু (শ্রীলংকা) দলীয়ভাবে তবলায় একটি লহরা পরিবেশন করি।

লোহড়ী পর্ব

১৩ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক হিন্দি শিক্ষণ বিভাগ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের প্রসিদ্ধ লোহড়ী পর্ব উদ্‌যাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ড. কৃষ্ণগোপাল কপুর লোহড়ী পর্বের উৎপত্তি ও তাৎপর্য বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা ভাংড়া-সিদ্ধা পরিবেশন করেন।

২৬ জানুয়ারি উদ্‌যাপন

২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে গান্ধী ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী শিক্ষার্থীরা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে তবলা প্রশিক্ষক শ্রী দীপক প্রভাকর এবং নৃত্য প্রশিক্ষক শ্রীমতী জ্যোতি খণ্ডেলবালের পরিকল্পনা ও কোরিওগ্রাফিতে আমি এবং নার্গিস সুলতানা তবলা এবং কত্থকের একটি যুগলবন্দী পরিবেশন করি।

বসন্ত পঞ্চমী পর্ব

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ আন্তর্জাতিক হিন্দি শিক্ষণ বিভাগ এবং অধ্যাপক শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে নাজির সভাগারে যৌথভাবে বসন্ত পঞ্চমী পর্ব পালন করা হয়। এ পর্বে সরস্বতী দেবীর পূজা-অর্চনা এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এ-পর্বে সংস্থানের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১৬-১৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে বিভাগীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানের রেজিস্ট্রার প্রফেসর বীণা শর্মা। ছেলেদের ভলিভল প্রতিযোগিতায় আমাদের দল (আমিসহ দক্ষিণ কোরিয়ার কিম দং হুক, শ্রীলংকার দিমুতু চতুরঙ্গ ও আফগানিস্তানের আহমদ জাকি) প্রথম স্থান লাভ করে। ছেলেদের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় আমাদের দল (আমি ও থাইল্যান্ডের সুপাসেক) দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। ছেলেমেয়ে যৌথ ক্যারাম প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম স্থান লাভ করি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানের নাজির সভাগারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাগারে সংস্থানের সকল শিক্ষক, দেশী-বিদেশী শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা দুইজন বাংলাদেশী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উৎপত্তি এবং বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরি। তারপর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?' গানটির একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করি। সভাগারে উপস্থিত সবাই দাঁড়িয়ে বিপুল করতালির মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে ৩১টি দেশের বিদেশী শিক্ষার্থী এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত স্বদেশী শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় গান ও কবিতা পরিবেশনার মাধ্যমে নিজ নিজ মাতৃভাষা তথা বিশ্বের সকল মাতৃভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। বৈশ্বিক পরিসরে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের এই গর্বিত এবং আনন্দঘন স্মৃতি আমাদের মনে চিরসবুজ হয়ে থাকবে।

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

২২-২৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানে বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় সকল বিদেশী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে রংগুলি, স্বদেশী একক সংগীত, স্বদেশী সমবেত সংগীত, স্বদেশী একক নৃত্য, স্বদেশী সমবেত নৃত্য এবং দ্বিতীয় দিনে একক সংগীত, হিন্দি সমবেত সংগীত, হিন্দি একক নৃত্য, হিন্দি সমবেত নৃত্য, একক তবলাবাদন, ফেন্সি ড্রেস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। স্বদেশী একক সংগীত এবং হিন্দি একক নৃত্য প্রতিযোগিতায় নার্গিস সুলতানা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। হিন্দি সমবেত নৃত্য প্রতিযোগিতায় নার্গিস সুলতানার দল (নার্গিস সুলতানাসহ পোল্যান্ডের অগাতা ও মায়ানমারের আশাকুমারী প্রথম স্থান লাভ করেন। একক তবলা বাদন প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম স্থান লাভ করি।

দ্বিতীয় শিক্ষাসফর

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বাস্তবিক জ্ঞান প্রদানের জন্য ৪-৮ মার্চ কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থান আয়োজিত দ্বিতীয় শিক্ষাসফরে বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভারতের উত্তরাখণ্ড প্রদেশের হরিদ্বার এবং হৃষিকেশে নিয়ে যাওয়া হয়। হরিদ্বারের পতঞ্জলি যোগপীঠে বাবা রামদেব বিদেশী শিক্ষার্থীদের যোগ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বানপ্রস্থ আশ্রমে বিদেশী শিক্ষার্থীদের বাবা-মা এবং গুরু পূজন পরম্পরা এবং পদ্ধতি, বৈদিক সংস্কৃতি, এবং যোগগ্রামে ভারতীয় পারম্পরিক প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্পর্কে পরিচিতি প্রদান করা

হয়। হৃষিকেশে শিক্ষার্থীরা ২৯তম আন্তর্জাতিক যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। পরমার্থ নিকেতন আশ্রমের গঙ্গাঘাটে শিক্ষার্থীরা গঙ্গা আরতিতে অংশগ্রহণ করেন। স্বামী চিদানন্দ সরস্বতীর সান্নিধ্যে বিদেশী শিক্ষার্থী এবং যোগ সাধকেরা বিশ্ব শান্তি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্বচ্ছতার মহাসংকল্প গ্রহণ করেন। বিদেশী শিক্ষার্থীরা জনপ্রিয় গায়ক কৈলাশ খেরের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপভোগ করেন।

হোলি মিলনোৎসব

১০ মার্চ কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানের নাজির সভাগারে হোলি মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে জ্যোতিষী ড.কিরণ জেটলি হোলি উৎসবের উৎপত্তি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। পরস্পর পরস্পরের গায়ে গুলাল লাগিয়ে সবাই হোলির শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

সমাপন সমারোহ

২৮ এপ্রিল বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, সার্টিফিকেট বিতরণ এবং পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানের নির্দেশক প্রফেসর নন্দকিশোর পাণ্ডে, রেজিস্ট্রার প্রফেসর বীণা শর্মা, তথ্য ও ভাষা প্রযুক্তি বিভাগের বিভাগাধ্যক্ষ প্রফেসর দেবেন্দ্র শুক্ল, আন্তর্জাতিক হিন্দি শিক্ষণ বিভাগের বিভাগাধ্যক্ষ ড. গঙ্গাধর বানোডে সহ সকল প্রশিক্ষক, বিদেশী শিক্ষার্থী, সংস্থানের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকার ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের হিন্দি শিক্ষিকা ড. অপর্ণা পাণ্ডের উপস্থিতি আমাদের আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানের বার্ষিক পত্রিকা *হিন্দি বিশ্ব ভারতী* ২০১৭-র মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সার্বিক ফলাফলে হিন্দি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স ২০১৬-১৭-য় আমি প্রথম স্থান, শ্রীলংকার নিশাদি লকমিনি অধিকারী দ্বিতীয় স্থান এবং নার্গিস সুলতানা তৃতীয় স্থান লাভ করি। অনুষ্ঠানে সকল বিদেশী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থী এবং বিভাগীয় সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়।

যোগ এবং জ্যোতিষশাস্ত্র কোর্স আমি সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করি। জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ হিসেবে সংস্থানের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারীর হস্তরেখা আমি বিচার করেছি।

সংস্থানের সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পাশাপাশি সাপ্তাহিক এবং সরকারি ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে আমরা আগ্রার তাজমহল, আগ্রা দুর্গ, সেকান্দ্রা, উত্তর প্রদেশের মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিওর, ঝাঁসি, রাজস্থানের বায়ানা, আজমির শরীফ, জয়পুর, দিল্লি ইত্যাদি শহরের ঐতিহাসিক স্থাপনা দর্শন করি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি রাজস্থানের কোটা, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহর, বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি ও কামারপুকুর দর্শন করি।

১৭-৩১ ডিসেম্বর শীতকালীন অবকাশে আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে মহারাষ্ট্রের বর্ধা, দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের চেন্নাই, রামেশ্বরম, মাদুরাই এবং কন্যাকুমারীর ঐতিহাসিক এবং দর্শনীয় স্থান দর্শন করি এবং নার্গিস সুলতানা বান্ধবীদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, কোচবিহার এবং দার্জিলিংয়ের ঐতিহাসিক এবং দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখেন।

সবার উপরে মানুষ সত্য

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, একসাথে থাকবই
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকব...'

বাঙালি জাতির এই মূলমন্ত্রকে কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থানের বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-ভাষার সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে, নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থেকে সকলকে প্রয়োজনীয় নোট সরবরাহ করে তথা যে কোন প্রয়োজনে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে সবার সঙ্গে আমরা আন্তরিক বন্ধন স্থাপন করেছিলাম।

বর্ণাঢ্য এবং বৈচিত্র্যময় মধুর অভিজ্ঞতা নিয়ে ২ মে ২০১৭ বাংলাদেশে ফিরে আসি। ১৪ জুন বারিধারাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে বাংলাদেশে ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা আমাদের অভিনন্দন জানান।

বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা লাভ করার এবং বৈশ্বিক পরিসরে প্রিয় মাতৃভূমির প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ প্রদানের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ও আইসিসিআর-এর ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকার পরিচালক শ্রীমতী জয়শ্রী কুণ্ডু, হিন্দি শিক্ষিকা ড. অপর্ণা পাণ্ডেসহ সকল সহপাঠী এবং শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অঞ্জয়রঞ্জন দাস
শিক্ষার্থী, হিন্দি ভাষা বিভাগ
ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

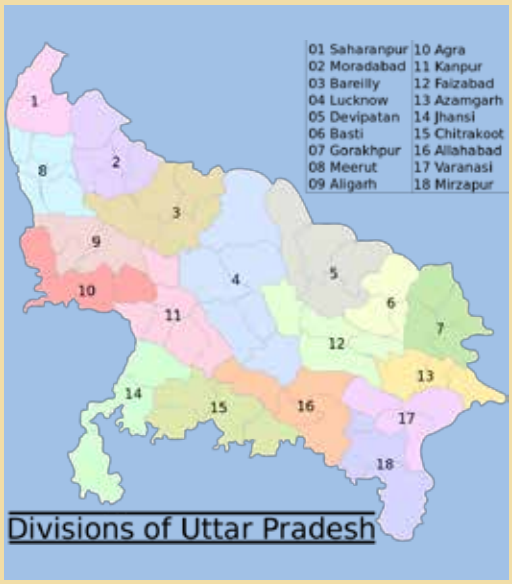

এক নজরে উত্তর প্রদেশ

দেশ	ভারত
রাজধানী	লক্ষ্ণৌ
জেলা	৭৫টি
প্রতিষ্ঠা	২৪ জানুয়ারি ১৯৫০
সরকার	
• শাসকবর্গ	উত্তর প্রদেশ সরকার
• রাজ্যপাল	রাম নায়েক
• মুখ্যমন্ত্রী	যোগী আদিত্যনাথ (বিজেপি)
• বিধানসভা	দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট বিধান পরিষদ ১০০ বিধানসভা ৪০৪
• সংসদীয় আসন	রাজ্যসভা ৩১, লোকসভা ৮০
• হাই কোর্ট	এলাহাবাদ হাই কোর্ট
ক্ষেত্রফল	
• মোট	২,৪৩,২৯০ বর্গকিমি (৯৩,৯৩০ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	৪র্থ
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	১৯,৯৮,১২,৩৪১
• ক্রম	১ম
• ঘনত্ব	৮২০/বর্গকিমি (২১০০/বর্গমাইল)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-UP
সরকারি ভাষা	হিন্দি, উর্দু
ওয়েবসাইট	www.up.gov.in

রাম নায়েক

যোগী আদিত্যনাথ

রাজ্য পরিচিতি

উত্তর প্রদেশ

উত্তর প্রদেশ বহু সাংস্কৃতিক, বহু জাতিগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, নদী, অরণ্য ও বিস্তৃত সমভূমির বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ্য। ভারতে পর্যটক গন্তব্যের একটা বিশাল অংশ উত্তর প্রদেশ অভিমুখীন যার সংখ্যা সাড়ে ৩ কোটি। বিদেশী পর্যটকদের অর্ধেকের বেশি, যাঁরা প্রতিবছর ভারত ভ্রমণে আসেন, তাঁদের অবশ্য দ্রষ্টব্য দু'টি হচ্ছে তাজমহল ও গঙ্গা। শুধু আগ্রা ভ্রমণে আসেন বছরে ১০লাখ বিদেশী পর্যটক। এর দ্বিগুণ আসেন দেশী পর্যটক। উত্তর প্রদেশ বহু সাংস্কৃতিক, বহু জাতিগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, নদী, অরণ্য ও বিস্তৃত সমভূমির বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ্য। ভারতে পর্যটক গন্তব্যের একটা বিশাল অংশ উত্তর প্রদেশ অভিমুখীন যার সংখ্যা সাড়ে ৩ কোটি।

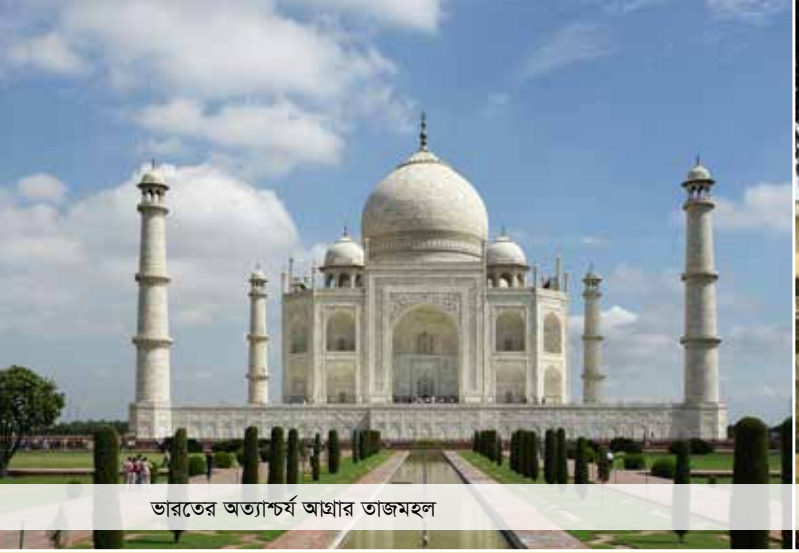

ভারতের অত্যাশ্চর্য আগ্রার তাজমহল

কেন্দ্রীয় ঔষধ গবেষণা প্রতিষ্ঠান

প্রতিবছর ভারত ভ্রমণে আসেন এমন বিদেশী পর্যটকদের অর্ধেকের বেশির অবশ্য দ্রষ্টব্য দু'টি হচ্ছে তাজমহল ও গঙ্গা। শুধু আগ্রা ভ্রমণে আসেন বছরে ১০ লাখ বিদেশী পর্যটক। এর দ্বিগুণ আসেন দেশী পর্যটক। উত্তর প্রদেশে পর্যটক আকর্ষণের এত বিরাট আয়োজন রয়েছে যে বহু মানুষ বহু উদ্দেশ্যে এখানে আসেন। পৃথিবীর ১৭তম জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশ ভারতের প্রাচীনতম সংস্কৃতি ও সভ্যতার দাবিদার। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালনভূমি হিসেবে উত্তর প্রদেশকে চিহ্নিত করার কারণ হচ্ছে গঙ্গা– যার তীরে বহু প্রাচীন নগর-জনপদ বিকশিত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তর প্রদেশের বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং স্বাধীনতার পর এটি রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে।

ভূগোল

উত্তর প্রদেশ ২৪°-৩১° ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৭°-৮৪° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এটি ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম রাজ্য। গাঙ্গেয় সমভূমি রাজ্যের তিন-চতুর্থাংশ অঞ্চল জুড়ে আছে। উত্তরাঞ্চল ছাড়া গোটা রাজ্যে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু বিরাজ করে। সমভূমি অঞ্চলে জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা ১২.৫°-১৭.৫° সেলসিয়াস এবং মে মাসে ২৭.৫°-৩২.৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিদ্যমান থাকে। রাজ্যের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫° সেলসিয়াস। বৃষ্টিপাত পূর্বাঞ্চলে ১০০০-২০০০ মিলিমিটার এবং পশ্চিমে ৬০০-১০০০ মিমি।

ইতিহাস

হিন্দুধর্মের দুই মহাকাব্য *রামায়ণ* ও *মহাভারত* উত্তর প্রদেশেই লিখিত হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের আবাসভূমি ছিল উত্তর প্রদেশ। এখন এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, গৌতম বুদ্ধের জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছিল উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ভক্তদের মধ্যে উপদেশ বিতরণ করে। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গোটা উত্তর প্রদেশ জুড়েই তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এলাহাবাদ ও বারাণসীতে তাঁর সময়কালের অনুশাসন পাওয়া গেছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর বর্তমান উত্তর প্রদেশ ৪টি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সুরসেবা, উত্তর পাঞ্চাল, কোসল এবং কৌসম্বী।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে শক জাতিগোষ্ঠী অভিযান চালায়। কনিষ্ক ও তাঁর উত্তরসূরীদের সময়কালের ইতিহাস তেমন জানা যায় না। গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রায় গোটা উত্তর প্রদেশ শাসন করে এবং এ সময়ে সাংস্কৃতিক ও স্থাপত্যকর্ম সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছিল। গুপ্তদের পতন এবং মধ্য এশিয়ায় হুনদের আক্রমণ প্রায় সমান্তরাল ঘটনা। হুনরা মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়রে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধন কনৌজ অধিকার করেন। পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন এবং উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক প্রচারণা চালান। তিনি ফতেহ্‌পুর সিক্রির কাছে রাজপুতদের পরাজিত করেন। অপরদিকে তাঁর পুত্র হুমায়ন অযোধ্যায় পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনের পর জৌনপুর

ভারতের এবং পৃথিবীর প্রথম প্রতিবন্ধী স্কুল জেআরএইচইউ

ও গাজিপুর জয় করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ন কনৌজে শের শাহ্ সুরীর হাতে পরাজিত হয়ে সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ্ সুরীর মৃত্যুর পর হুমায়ন তাঁর সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র আকবর শাসনক্ষমতা লাভ করে মুঘল সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটান। তিনিই সবচেয়ে সফল মুঘল সম্রাট। তিনি সারা ভারতে তাঁর ক্ষমতা সম্প্রসারিত করেন। তাঁর সময়কালে আগ্রা ভারতের রাজধানী হয় এবং শিল্প ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি আগ্রা ও এলাহাবাদে বহু দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর সম্রাট হন। তাঁর সময়কালে ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এক

তেরাই অঞ্চলের একটি দৃশ্য

অশোক গাছ

জেতবন বৌদ্ধ বিহারে বোধিবৃক্ষ

এলাহাবাদে নতুন যমুনা সেতু

নতুন উচ্চতায় ওঠে। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহজাহানের সময়কাল ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত। তাঁর সময়ে তাঁর স্ত্রী মুমতাজ মহলের স্মৃতি রক্ষায় চিরায়ত আশ্চর্য তাজমহল নির্মিত হয়। আওরঙ্গজেবের শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সম্প্রসারণ চরমে পৌঁছেছিল।

আধুনিক উত্তর প্রদেশ জাতীয় পরিসরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্ম দিয়েছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী, জওহরলাল নেহ্‌রু, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও চরণ সিং মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট নাম, যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং এই মহান দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেন।

বিখ্যাত কথক নাচ

রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণ-সীতা

প্রশাসনিক কাঠামো

উত্তর প্রদেশ ১৭টি বিভাগে ৭০টি প্রশাসনিক জেলার সমন্বয়ে গঠিত। এগুলি হচ্ছে–

আগ্রা বিভাগ: আগ্রা, আলিগড়, ইটাহ্, ফিরোজাবাদ, মঈনপুরী মহামায়া নগর (হাথরা) ও মথুরা;

এলাহাবাদ বিভাগ: এলাহবাদ, কৌসুম্বী, ফতেহ্‌পুর ও প্রতাপগড়;

আজমগড় বিভাগ: আজমগড়, বালিয়া, মৌ;

বেরিলি বিভাগ: বেরিলি, বাদাউন, পিলিভিট, শাহজাহানপুর;

বস্তি বিভাগ: বস্তি, সিদ্ধার্থনগর, সন্ত কবীর নগর;

চিত্রকূট বিভাগ: বান্দা, চিত্রকূট, হারিমপুর, মাহোবা;

দেবীপতন বিভাগ: গোণ্ডা, বাহ্‌রাইচ, শ্রাবস্তী, বলরামপুর;

ফাইজাবাদ বিভাগ: ফাইজাবাদ, আম্বেদকর নগর, বড়বাঁশি, সুলতানপুর;

গোরগপুর বিভাগ: গোরগপুর, কুশিনগর, দেবারিয়া, মহারাজগঞ্জ;

ঝাঁসি বিভাগ: জালাউন, ঝাঁসি, ললিতপুর;

কানপুর বিভাগ: কানপুর নগর, কানপুর দেহাত (আকবরপুর জেলা) ইটাবাহ্, ফররুখাবাদ, কনৌজ, অরাইয়া;

লক্ষ্ণৌ বিভাগ: লক্ষ্ণৌ, হরদৈ, লাখিমপুর খেরি রায়বেরিলি, সীতাপুর, উন্নাও;

মিরাট বিভাগ: মিরাট, বুলন্দশহর, গৌতম বুদ্ধ নগর, গাজিয়াবাদ, বাগপত;

মির্জাপুর বিভাগ: মির্জাপুর, সন্ত রবিদাস নগর (ভাদোহী জেলা), সোনভদ্রা;

মোরাদাবাদ বিভাগ: মোরাদাবাদ, বিজনর, রামপুর, জ্যোতিবা ফুলে নগর

সাহারানপুর বিভাগ: সাহারানপুর, মুজফ্‌ফরনগর;

বারাণসী বিভাগ: বারাণসী, চান্দৌলি, গাজিপুর, জৌনপুর।

ব্যবসায় ও অর্থনীতি

উত্তর প্রদেশের মোট জনশক্তির এক-তৃতীয়াংশ কাজ করে টেক্সটাইল ও চিনি রিফাইনিং শিল্পে। রাজ্যের অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য শিল্পের মধ্যে রয়েছে ভেজিটেবল ওয়েল, পাট ও সিমেন্ট।

কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলি বড় বড় কারখানা স্থাপন করেছে যেখানে ভারী যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি, ইস্পাত, বিমান, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ ও সার উৎপাদিত হয়। উত্তর প্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি প্রধান প্রকল্প রয়েছে। এর একটি হচ্ছে মথুরায় অবস্থিত তেল শোধনাগার ও অপরটি হচ্ছে মির্জাপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কয়লাখনি।

গাঙ্গেয় সমভূমির অংশ

এলাহাবাদ সঙ্গমে কুম্ভ মেলার একাংশ

রাজ্য সরকার মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রভূত বিস্তার ঘটিয়েছে। কৃষি হচ্ছে রাজ্যের অর্থনীতির প্রধান উপাদান। প্রধান উৎপাদিত শস্যের মধ্যে ধান, গম, সিলেট, বার্লি ও আখ উল্লেখযোগ্য।

গত শতকের ষাটের দশকের শেষ নাগাদ গম ও ধানের দ্রুত উৎপাদনশীল জাত প্রচলন, অধিকতর সার প্রাপ্তি এবং সেচের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে উত্তর প্রদেশ দেশের বৃহত্তম খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

পর্যটন

উত্তর প্রদেশকে অনায়াসে ভারতের নাভিকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ভারতের সব চিত্রই এখান থেকে অনুভব করা যায়। এই রাজ্য পৃথিবীকে তাজমহল উপহার দিয়েছে, বারাণসী আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, সারনাথে গৌতম বুদ্ধ প্রথমবারের মত ভক্তদের সামনে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। মথুরা ভগবান কৃষ্ণের জীবন ও কর্মক্ষেত্র। উত্তর প্রদেশে অনেক পর্যটক আকর্ষণ দ্রষ্টব্য রয়েছে। এ-সবের মধ্যে আগ্রা, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, দেওগড়, দুধোয়া বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র, কুশিনগর, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, সারনাথ, শ্রাবস্তী, বারাণসী, বৃন্দাবন, বিথুর, কালিঞ্জর ও কনৌজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

নদী

উত্তর প্রদেশের প্রদান নদীগুলি হচ্ছে অলকানন্দা, রামগঙ্গা, ভাগীরথী, যমুনা ও গঙ্গা।

শিক্ষা

উত্তর প্রদেশের নারী শিক্ষার হার মন খারাপ করার মত– ৪২.৯৮ শতাংশ, তবে পুরুষ সাক্ষরতার হার যথেষ্টই ভাল– ৭০.২৩ শতাংশ। সার্বিক সাক্ষরতার হার এখনও যথেষ্ট খারাপ– ৫৭.২৩ শতাংশ এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে যথেষ্ট নীচে। মোট জনসংখ্যাকে সাক্ষর করার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় উত্তর প্রদেশে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের মত বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য এনজিও এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

উচ্চতর শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা পর্যায়ে উত্তর প্রদেশে ১৬টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এসবের মধ্যে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর প্রদেশ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, মদনমোহন মালব্য প্রকৌশল কলেজ, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, চৌধুরী চরণ সিং বিশ্ববিদ্যালয় (মিরাট), আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলোজি (কানপুর), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (লক্ষ্ণৌ), দয়ালবাগ শিক্ষা ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (এলাহাবাদ), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এলাহবাদ) ছাড়াও অনেকগুলি পলিটেকনিক, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এবং শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে।

বেনারসে গঙ্গার ঘাট

খাবার-দাবার

উত্তর প্রদেশ খাদ্যরসিকদের স্বর্গ। রান্নার সব ধরনের তরকারি পাওয়া যায়। তবে কচুরি ও পুরির মত তেলে ভাজা খাবারও পাওয়া যায়, যা উৎসবের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। অযোধ্যার রান্না মাংসের খ্যাতি জগৎজোড়া। এ রাজ্যে স্যাভোরি ও মিষ্টান্নের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। মিঠাই থেকে জিলাপি কী নেই এ তালিকায়! লক্ষ্ণৌ বিরিয়ানি ও মাংসের জন্য সারা বিশ্বে বিখ্যাত।

শিল্প ও সংস্কৃতি

জনসংখ্যার অধিকাংশই ইন্দো-দ্রাবিড়ী জাতিগত গোষ্ঠীর। অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন হিমালয় অঞ্চলে, যাদের উৎস এশিয়াটিক।

জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের বেশি হিন্দু, ১৫ শতাংশের বেশি মুসলমান

বেনারসে গঙ্গাতীরে সূর্যবন্দনা

জিভে জল আনা উত্তর প্রদেশের উদরপূর্তির থালি

রাংতামোড়া বাহারি পান

হারদই জেলার উচ্চফলনশীল নাসটারটিয়াম (কলমি/হেলেঞ্চা জাতীয় শাক)

এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শিখ, খ্রিস্টান, জৈন ও বৌদ্ধ রয়েছে।

উত্তর প্রদেশের হস্তশিল্প শত শত বছর ধরে খ্যাতি অর্জন করেছে। ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের বৈচিত্র্য বিপুল– তাঁত, ধাতব পণ্য, কারুশিল্প, সিরামিক, পাথরশিল্প, পুতুল, চামড়াজাত পণ্য, হাতির দাঁতের জিনিস, পেপিয়ের ম্যাচে (ময়দা, আঠা দিয়ে কাগজের বিভিন্ন মনোহারী খেলনাপাতি), হাড় ও শিংয়ের পণ্য, বেত ও বাঁশের জিনিস, সুগন্ধি দ্রব্য ও গান-বাজনার সরঞ্জাম। এসব হস্তশিল্প গোটা রাজ্যে পাওয়া যায় তবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিক্রয় ও প্রদর্শন কেন্দ্রগুলি বারাণসী, আমগড়, মৌনাথ ভঞ্জন, গাজিপুর, মিরাট, মুরাদাবাদ ও আগ্রায় অবস্থিত।

ভাদোহী ও মির্জাপুরের কার্পেটের দাম সারা বিশ্বেই। বারাণসীর রেশম ও ব্রোকেড, মুরাদাবাদের অলংকারিক পিতলের তৈজসপত্র, লক্ষ্ণৌয়ের চিকন (এক ধরনের সেলাই), নাগিনার আবলুস কাঠের কাজ, ফিরোজাবাদের কাচশিল্প, সাহারানপুরের বাঁকানো কাঠের কাজও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

খুরজা, চুনার, লক্ষ্ণৌ, রামপুর, বুলন্দশহর, আলিগড় ও আজমগড়ে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প কেন্দ্র অবস্থিত। খুরজার সিরামিকের নানারঙের থালা-বাসন ও ফুলদানি খুবই আকর্ষণীয়।

মুরাদাবাদে অনুপম পিতলের তৈজসপত্র তৈরি হয়। এছাড়াও রূপা, সোনার মিনাকারি, হীরার ছাট, রূপার অলংকার বারাণসী ও লক্ষ্ণৌকে বিশ্ববিখ্যাত করে তুলেছে।

গঙ্গার ঘড়িয়াল

নৃত্য ও সংগীত

সংগীতের বিভিন্ন যন্ত্র উৎপাদনে পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত উত্তর প্রদেশ– প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যার উল্লেখ্য পাওয়া যায়। গুপ্ত আমলে (৩২০-৫৪০ খ্রিস্টাব্দে) সংগীতের খুব বিকাশ ঘটে এবং সেই সময় থেকে উত্তর প্রদেশ তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।

মুঘল সম্রাট আকবরের নবরত্নসভার দুই সদস্য ছিলেন তানসেন ও বৈজু বাওরা। সংগীতের ভুবনে তাদের অবদানের জন্য আজও তারা অবিস্মরণীয় ও অমর হয়ে আছেন।

সেতার ও তবলার উদ্ভাবন এ সময়ে এ অঞ্চলেই হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর প্রদেশে কথক শাস্ত্রীয় নৃত্যের উদ্ভব হয়। এটি বৃন্দাবন ও মথুরা মন্দিরের ভক্তিমূলক নাচ। এটি উত্তর প্রদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাস্ত্রীয় নৃত্য।

স্থানীয় নাচ-গানেরও খুব চল আছে। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত অধিকাংশ পল্লীগীতি ঋতুভিত্তিক। স্থানীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের নাচ ও গান। এসবের মধ্যে আছে মির্জাপুর ও বারাণসীর কাজরি, লোকজ মহাকাব্য উদল এবং বিভিন্ন গ্রামীণ নৃত্য।

উৎসব

উত্তর প্রদেশের মেলা ও উৎসবের তালিকা দীর্ঘ। এখানে বছরে দু'হাজার দুশো তিরিশটির বেশি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব মেলা ও উৎসবের কয়েকটি বিভিন্ন জায়গায় একই সময়ে আয়োজন করা হয়। অন্যান্য মেলার স্থানিক গুরুত্ব রয়েছে।

গোল্ডেন হারভেস্টের সঙ্গে উৎসব ও খাওয়া-দাওয়ার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ইন্দ্রিয় উপলব্ধিগত বসন্ত, পুরাণ বা ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা অথবা বিগত কোন মহামানবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এসব আমোদ-উৎসবের আয়োজন করা হয়। কিছু উৎসব গান, নাচ ও আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়, আবার কিছু অনুষ্ঠান, উৎসাহব্যঞ্জক খাওয়া-দাওয়ার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। এসব মেলা ও উৎসব মানুষকে তাদের সংস্কৃতি এবং শৈল্পিক কর্মকাণ্ড সজীব রাখতে সাহায্য করে।

সূত্র উত্তর প্রদেশ সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংকলিত
অনুবাদ **মানসী চৌধুরী**

আশাপূর্ণা দেবী

ভারতীয় বাঙালি ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও শিশুসাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী বিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবন, বিশেষত সাধারণ মেয়েদের জীবনযাপন ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য বিখ্যাত। ব্যক্তিজীবনে নিতান্তই এক আটপৌরে মা ও গৃহবধূ আশাপূর্ণা ছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। বাংলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল না। প্রথাগত শিক্ষালাভেও বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁকে দান করে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকার আসন। তাঁর *প্রথম প্রতিশ্রুতি-সুবর্ণলতা-বকুলকথা* উপন্যাসত্রয়ী বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। তাঁর একাধিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়েছে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র। তিন হাজার ছোটগল্প ও আড়াইশোর বেশি উপন্যাসের রচয়িতা আশাপূর্ণা সম্মানিত হয়েছিলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কারসহ দেশের একাধিক সাহিত্য পুরস্কার, অসামরিক নাগরিক সম্মান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সম্মান রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করেন। ভারত সরকার তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান সাহিত্য অকাদেমি ফেলোশিপে ভূষিত করেন।

আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম ১৯০৯ সালের ৮ জানুয়ারি (বাংলা ২৪ পৌষ, ১৩১৫) শুক্রবার সকালে উত্তর কলকাতায় মাতুলালয়ে। বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট; সে-যুগের জনপ্রিয় বাংলা পত্রিকাগুলিতে ছবিও আঁকতেন। তাঁর রাজভক্তি ও রক্ষণশীলতার বিপরীতে অবস্থান করতেন মা সরলাসুন্দরী দেবী। সাহিত্যপাঠই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র 'পরমার্থ'। রাজনৈতিক আদর্শে ছিলেন কট্টর ব্রিটিশ-বিদ্বেষী স্বদেশী।

গুপ্ত-পরিবারের আদিনিবাস ছিল হুগলি জেলার বেগমপুরে। যদিও আশাপূর্ণা দেবীর জীবনের সঙ্গে এই অঞ্চলটির কোনও প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। তাঁর ছোটবেলা কেটেছে উত্তর কলকাতাতেই, ঠাকুরমা নিস্তারিনী দেবীর পাঁচ পুত্রের একান্নবর্তী সংসারে। পরে হরেন্দ্রনাথ যখন তাঁর আপার সার্কুলার রোডের (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড) নিজস্ব বাসভবনে উঠে আসেন, আশাপূর্ণার বয়স সাড়ে পাঁচ বছর। কিন্তু বাল্যের ওই কয়েকটি বছর তাঁর মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। পরবর্তীকালে সাহিত্যেও নানাভাবে এঁকেছিলেন 'দেহে ও মনে অসম্ভব শক্তিমতী' তাঁর সেই ঠাকুরমার ছবি।

ঠাকুরমার কঠোর অনুশাসনে প্রথাগত শিক্ষার সৌভাগ্য হয়নি আশাপূর্ণার। পরবর্তীজীবনে এক স্মৃতিচারণায় এ প্রসঙ্গে আশাপূর্ণা বলেছিলেন, '...ইস্কুলে পড়লেই যে মেয়েরা বাচাল হয়ে উঠবে, এ তথ্য আর কেউ না জানুক আমাদের ঠাকুমা ভালভাবেই জানতেন, এবং তাঁর মাতৃভক্ত পুত্রদের পক্ষে ওই জানার বিরুদ্ধে কিছু করার শক্তি ছিল না।' তবে এই প্রতিকূল পরিবেশেও মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে দাদাদের পড়া শুনে শুনে পড়তে শিখে গিয়েছিলেন তিনি; বর্ণপরিচয় আয়ত্ত করেছিলেন বিপরীত দিক থেকে। মা সরলাসুন্দরী ছিলেন একনিষ্ঠ সাহিত্য-পাঠিকা।

সেই সাহিত্যপ্রীতি তিনি তাঁর কন্যাদের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। *সাধনা*, *প্রবাসী*, *ভারতবর্ষ*, *সবুজপত্র*, *বঙ্গদর্শন*, *বসুমতী*, *সাহিত্য*, *বালক*, *শিশুসাথী*, *সন্দেশ* প্রভৃতি ১৬-১৭টি পত্রিকা এবং দৈনিক পত্রিকা *হিতবাদী* তো বাড়িতে আসতই, তাছাড়াও সরলাসুন্দরী ছিলেন স্বনামধন্য *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ*, *জ্ঞানপ্রকাশ লাইব্রেরি* ও *চৈতন্য লাইব্রেরির* সদস্য। বাড়িতে সে-যুগের সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডারও ছিল। এই অনুকূল পরিবেশে মাত্র ছয় বছর বয়স থেকেই পাঠ্য ও অপাঠ্য নির্বিশেষে পুরোদমে পড়াশোনা শুরু করে দেন আশাপূর্ণা। পরবর্তীকালে এই বাল্যকাল সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'হিসেবমত আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে সংসারের ঊর্ধ্বে একটি স্বর্গীয় জগতে। বই পড়াই ছিল দৈনিক জীবনের আসল কাজ।'

ছেলেবেলার দিনগুলি সম্পর্কে আশাপূর্ণা বলেছেন, '...খুব ডাকাবুকো ছিলাম। ছেলেবেলায় ঘুড়ি ওড়াতাম, মারবেল খেলতাম। ক্যারাম খেলতাম দাদাদের সঙ্গে।' আবার পিতামাতার সবচেয়ে বাধ্য মেয়ে হওয়ার জন্য তাঁদের সবচেয়ে প্রিয়পাত্রীও হয়ে উঠেছিলেন। সেদিনের নির্মীয়মান কলকাতা মহানগরী ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। আর প্রিয় ছিলেন দিদি রত্নমালা ও বোন সম্পূর্ণা। তাঁরা তিনজনে ছিলেন, আশাপূর্ণার ভাষায়, '... একটি অখণ্ড ট্রিলজির অংশ। এক মলাটে তিনখানি গ্রন্থ।' আপার সার্কুলার রোডের নতুন বাড়িতে উঠে আসার কিছুদিনের মধ্যে এই অখণ্ড আনন্দে বিচ্ছেদের সুর বাজে। বিয়ে হয়ে যায় দিদি রত্নমালার। সেই নিঃসঙ্গতা দূর করতে একদিন আশাপূর্ণা ও সম্পূর্ণা করে ফেলেন এক দুঃসাহসিক কাজ। দুই বোনের স্বাক্ষরে চিঠি পাঠান রবীন্দ্রনাথকে। আবদার, 'নিজের হাতে আমাদের নাম লিখে একটি উত্তর দেবেন।' কাঙ্ক্ষিত সেই উত্তর আসতেও দেরি হয়নি। আর এর পরেই বহির্বিশ্বে আত্মপ্রকাশ ঘটে 'স্যাঁতস্যাঁতে বাংলাদেশের বিদ্রোহিনী নারী'র। ১৯২৪ সালে, মাত্র ১৫ বছর ৮ মাস বয়সে কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা কালিদাস গুপ্তের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হয়। একমাত্র পুত্র সুশান্ত, পুত্রবধূ নূপুর, দুই নাতনী শতরূপা ও শতদীপাকে নিয়ে তাঁদের ছিল ছোট সুখী পরিবার। ১৯৯৫ সালের ১৩ জুলাই কলকাতায় এই অসামান্যা নারী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ● সংকলিত

৮ ডিসেম্বর ২০১৭ ছায়ানট মিলনায়তনে আইজিসিসি আয়োজিত সংগীতসন্ধ্যায় কলকাতার হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয়সংগীত শিল্পী শ্রীমতী মেঘদীপা গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবেশনা

৯ ডিসেম্বর শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আইজিসিসি আয়োজিত বহ্নিশিখা শিল্পীগোষ্ঠীর লোকগীতি পরিবেশনা

১২ ডিসেম্বর শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আইজিসিসি আয়োজিত বিজয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ড. সাহাদাৎ হোসেন নিপুর আবৃত্তি ও শ্রীমতী কমলিকা চক্রবর্তীর সংগীত পরিবেশনা

সংস্কৃতি সংবাদ

১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ সকাল ১১টায় ধানমন্ডিতে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে হিন্দি উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

২৩ ডিসেম্বর শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আইজিসিসি আয়োজিত অনুষ্ঠানে মিসেস ডালিয়া আহমেদের আবৃত্তি পরিবেশনা

৩০ ডিসেম্বর শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আইজিসিসি আয়োজিত অনুষ্ঠানে হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয়সংগীত শিল্পী শ্রী রবিন চৌধুরীর সংগীত পরিবেশনা

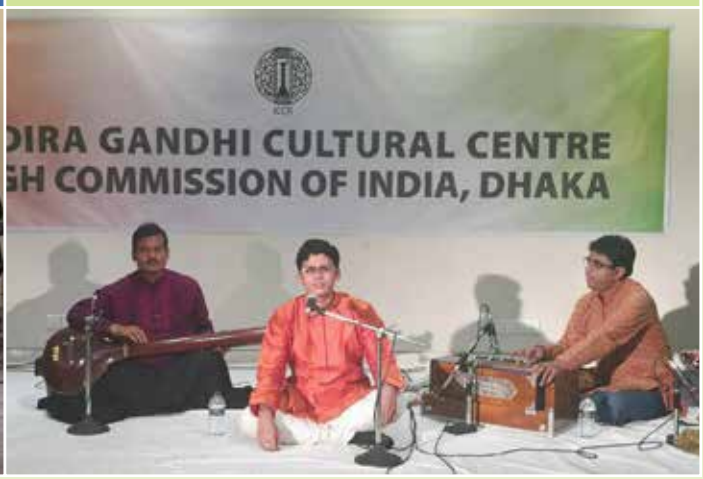

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra January 2018

বারিধারার কূটনৈতিক জোনে ভারতীয় হাই কমিশনে নবনির্মিত চ্যাঞ্চেরি ভবন

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন, লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in

/IndiaInBangladesh

@ihcdhaka

/HCIDhaka